

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“রমাদানে সাদাকাহর গুরুত্ব”

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা –আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিরা আকতার

রোলঃ ২২৭০২০২৭৪২২৮

২৬ মে, ২০২৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“রমাদানে সাদাকাহর গুরুত্ব”

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ
এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিরা আকতার

রোলঃ ২২৭০২০২৭৪২২৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “রমাদানে সাদাকাহর গুরুত্ব” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিরা আকতার, আইডিঃ ২২৭০২০২৭৪২২৮ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

মাও: শারফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

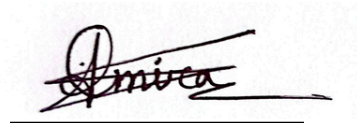
ঘোষণা পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “রমাদানে সাদাকাহর গুরুত্ব” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৫



(স্বাক্ষর)

সামিরা আকতার

রোলঃ ২২৭০২০২৭৪২২৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা	৬
২. সাদাকাহর সংজ্ঞায়ন ও প্রকারভেদ.....	৮
৩. ইসলামি শরিয়াহ ও জনজীবনে সাদাকাহর গুরুত্ব.....	১২
৪. স্পিরিচুয়াল প্রোডাক্টিভিটি: আধুনিক গবেষণার আলোকে সাদাকাহ.....	১৪
৫. সোশ্যাল প্রোডাক্টিভিটি: সাদাকাহ শ্রেষ্ঠ উম্মাহর দায়িত্ব.....	১৬
৬. দানশীলতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম	১৮
৭. রহমতের বসন্ত: মাহে রমাদান.....	২২
৮. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রমাদানের মাহাত্ম্য.....	২৪
৯. রমাদানে ইবাদতের বহুগুণে সওয়াব.....	২৬
১০. রমাদানে দানশীলতার অনন্য মর্যাদা.....	২৭
১১. রমাদানের সাদাকাহ: আল্লাহর গুণ ও রাসুলের বৈশিষ্ট্য.....	২৮
১২. স্বল্প দানে মহাপুরস্কার: পরকালীন মুনাফার সমীকরণ.....	৩১
১৩. যাকাত ও সাদাকাহ: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ.....	৩৩
১৪. নফস বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধিতে সাদাকাহর প্রভাব.....	৩৫
১৫. অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাদাকাহর ভূমিকা.....	৩৭
১৬. সামাজিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে রমাদানের সাদাকাহ.....	৩৯
১৭. রমাদানে সাদাকাহর অর্থ ব্যয়ের কিছু টিপস	৪১
১৮. সাদাকাহর মুহাসাবা	৪৩
১৯. আধুনিক যুগে সাদাকাহ প্রদানের কৌশল ও মাধ্যম.....	৪৪
২০. সাদাকাহ ও ডিজিটাল মাধ্যম: সম্ভাবনা ও সচেতনতা.....	৪৬
২১. রিয়া বা প্রদর্শনপ্রিয়তা: নেক আমল ধ্বংসের কারণ.....	৪৯
২২. দাওয়াতি কার্যক্রম ও নওমুসলিমদের পুনর্বাসনে সাদাকাহ.....	৫২
২৩. লাইলাতুল কদর ও রমাদানের শেষ দশকের দান-সদকা.....	৫৫
২৪. রমাদান-পরবর্তী সময়ে সাদাকাহর ধারাবাহিকতা.....	৫৬
২৫. সাদাকাতুল ফিতর: উদ্দেশ্য ও বিধান.....	৫৮
২৬. সাদাকায়ে জারিয়া: অনন্তকালের পাথেয়.....	৬০
২৭. সাদাকাহ কবুলের পূর্বশর্ত ও আদবসমূহ.....	৬২
২৮. বিশেষ সময় ও উপলক্ষে সাদাকাহ প্রদানের ফজিলত.....	৬৪
২৯. উপসংহার.....	৬৬

১.ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন, যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি তাকে ভালবাসেন, যে বলে, 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি'। তারপর সে এ কথার উপর অটল থাকে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে নবী আগমনের ধারার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। দরুদ ও সালামের পর আমি আপনাদের সামনে "রমাদানে সাদাকাহর গুরুত্ব" সম্বন্ধে কিছু কথা তুলে ধরছি।

"রমাদানে সাদাকাহর গুরুত্ব" উক্ত শিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এখানে ইসলামের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইসলামী জীবনদর্শনে রমাদান মাস কেবল সংযম ও উপবাসের মাস নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং মানবিক সহমর্মিতার এক অনন্য মৌসুম।। ইসলামে রমাদানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কুরআনে সূরা বাকারাতে বলা আছে,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا بَدَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থঃ রমাদান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা সহজ, তা চান আর যা তোমাদের জন্যে কষ্টকর তা চান না। এজন্যে যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে আর তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করানোর কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (আয়াত: ১৮৫)

অন্যদিকে সূরা ত্বালাকে সাদাকাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِنْفِقْ ۚ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

অর্থঃ বিত্তবান ব্যক্তি যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে। আর যার রিজিক সংকুচিত করা হয়েছে, সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ কাউকে তার প্রদত্ত সাধের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। (আয়াত:৭)

সূরা মুনাফিকুনে আরো বলা হয়েছে,

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তোমরা তা থেকে ব্যয় করো। অন্যথায় সে (মৃত্যুর সময়) বলবে, "হে আমার রব! আমাকে আর অল্প কিছুকাল অবকাশ দিলেন না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" (আয়াত:১০)

থিসিস নির্বাচনের সময় এই টপিকটা আমি আগ্রহ নিয়েই বেছে নিয়েছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে খুব নিরীহ টপিক মনে হলেও এর সাইকোলজিক্যাল, স্পিরিচুয়াল ও সামাজিক গুরুত্ব অতুলনীয়। ব্যক্তিগত পরিসরেও সাদাকাহ আমাদেরকে কীভাবে একজন প্রোডাক্টিভ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, তা জানলে অবাক হতে হয়। আখিরাত তো বটেই, দুনিয়াবি ফায়দা হাসিলের ক্ষেত্রেও সাদাকাহর ভূমিকা বিস্তৃত। থিসিসের জন্য পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি নিজেও বেশ আশ্চর্য হয়েছি।

সামাজিক সেবাখাতে যেমন বৃহত্তর সুযোগ রয়েছে, তেমনি রয়েছে সামাজিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগও। সচেতনভাবেই পুরো থিসিসজুড়ে কৌতূহলোদ্দীপক নানা বিষয় নিয়ে এসেছি। গৎবাঁধা কিছু টপিকের বাইরেও ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে সাদাকাহকে বোঝার চেষ্টা করেছি। চিন্তাশীল মানুষের জন্য চিন্তার খোরাক বের করার চেষ্টা করেছি।

সাদাকাহর নিজস্ব ফজিলত তো রয়েছেই, সাথে তা যদি রমাদানের মতো ফজিলতপূর্ণ মাসে ফরজ রোজার পাশাপাশি নফল ইবাদত হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আদায় করা যায়, তাহলে সাদাকাহর সাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি করা যাবে বলে আশা করা যায় ইন শা আল্লাহ। যা পরবর্তী অংশে রমাদান এবং সাদাকাহর আলাদা আলাদা মাহাত্ম্য ও তাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করার মাধ্যমে আলোচনা করা হবে।

সর্বোপরি, রমাদানে সাদাকাহ কেবল একটি আর্থিক ইবাদত নয়; বর্তমান ভোগবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় সাদাকাহর চেতনা মানুষকে সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয়। এই গবেষণার মাধ্যমে রমাদানে সাদাকাহর তাৎপর্য এমনভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠক বিষয়টিকে কেবল একটি নফল আমল হিসেবে নয়; বরং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের কার্যকর এক অনুষঙ্গ হিসেবেও অনুধাবন করতে পারেন। আশা করি, এই ক্ষুদ্র প্রয়াস চিন্তার জগতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বার উন্মোচন করবে এবং বাস্তব জীবনে সাদাকাহর চর্চায় উৎসাহ যোগাবে, ইন শা আল্লাহ।

২.সাদাকাহর সংজ্ঞায়ন ও প্রকারভেদ

সাদাকাহ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় করা যেকোনো কল্যাণকর বা দানশীল কাজ। এটি ইসলামী শরিয়তের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সাদাকাহর সংজ্ঞায়ন:

সাদাকাহর আভিধানিক অর্থ: 'সাদাকাহ' শব্দটি আরবি 'সিদকুন' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো সত্যতা বা সততা। একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণ করে এই দানের মাধ্যমে।

পারিভাষিক অর্থ: পরিভাষায়, সওয়াব বা নেকির আশায় নিজের উপার্জিত সম্পদ বা অন্য কোনো সাহায্য-সহযোগিতা নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে প্রদান করাকে সাদাকাহ বলে।। নিচে সাদাকাহর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

সাদাকাহর প্রকারভেদ:

সাদাকাহ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে:

১)সাদাকায়ে ওয়াজিবাহ(আবশ্যিক দান): এটি ওই দান যা করা প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। যেমন: যাকাত, ফিতরা এবং মানত করা কোনো দান।

২)সাদাকায়ে নাফেলা(ঐচ্ছিক দান): যা বাধ্যতামূলক নয়, বরং ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেমতো সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে যে কোনো সময় করে থাকে। এটিই সাধারণত আমরা সাধারণ অর্থে 'সাদাকাহ' হিসেবে চিনে থাকি।

আরেকটি প্রকার হলো:

৩)সাদাকায়ে জারিয়া(চলমান দান): এটি এমন দান যার সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। যেমন: মসজিদ বা মাদ্রাসা নির্মাণ, গাছ লাগানো, কূপ খনন করা বা কারো উপকারে আসে এমন জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া।

ইসলামে সাদাকাহর ধারণা কেবল টাকা-পয়সার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মহানবী (সা.)-এর হাদিস অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ভালো কাজই সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হতে পারে। নিচে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিছু অ-অর্থনৈতিক দান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। যেমন :

১.ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া বা অসহায়কে সাহায্য করা:

ইসলামে অন্নদানের গুরুত্ব কত বেশি, তা আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর এই হাদিসটি থেকে স্পষ্ট হয়:

আবদুল্ হ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, "ইসলামের কোন কাজটি সবচেয়ে ভালো?" তিনি বললেন, "তুমি মানুষকে আহার করাবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে সালাম দেবে।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১২)

ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ালে সরাসরি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত অর্জন করা যায়। হাদিসে এসেছে:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রচার করো, (মানুষকে) খাদ্য দান করো, আল্লাহর বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখো এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ পড়ো (তাহাজ্জুদ)। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩২৫১)

এছাড়াও রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে থাকেন।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

২. পিপাসায়ুক্ত ব্যক্তি বা প্রাণীকে পানি পান করানো:

ইসলামে শুধু মানুষকে নয়, যেকোনো ক্ষুধার্ত প্রাণীকে খাবার বা পানি দেওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "একবার এক ব্যক্তি পথ চলার সময় তার প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেল। সে একটি কূপে নেমে পানি পান করল। ওপর উঠে সে দেখল, একটি কুকুর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি ভাবল, কুকুরটিরও আমার মতো প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। সে আবার কূপে নামল এবং নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভরে তা মুখে কামড়ে ধরে ওপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি খাওয়াল। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" সাহাবিরাজি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! পশু-পাখিকে দয়া করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে?" তিনি বললেন, "প্রত্যেক প্রাণবান সত্তার (উপকার করার) মধ্যেই সওয়াব রয়েছে।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৩৬৩)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষকে ক্ষুধার্তকে অন্ন না দেওয়ার কারণে প্রশ্ন করবেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি।" বান্দা বলবে, "হে আমার রব! আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আমি আপনাকে কীভাবে খাবার খাওয়াতাম?" আল্লাহ বলবেন, "তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে খাবার খাওয়াতে, তবে তা আজ আমার কাছে পেতে?" (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৯)

৩. কারো সাথে সুন্দর ব্যবহার করা বা মুচকি হাসাও একটি সাদাকাহ:

ইসলামে হাসিমুখে কথা বলা এবং অন্যের সাথে সদয় আচরণ করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল একটি সামাজিক শিষ্টাচারই নয়, বরং একটি মহান ইবাদত এবং 'সাদাকাহ' বা দান হিসেবে গণ্য।

আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের মুখের সামনে তোমার মুচকি হাসি দেওয়াটাও তোমার জন্য একটি সাদাকাহ।" (জামে আত-তিরমিজি, হাদিস: ১৯৫৬)

আবু জর (রা.) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) আমাকে বলেছেন: "তুমি কোনো ভালো কাজকেই সামান্য বা তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করাও হোক না কেন।" জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে তাঁর দরবারে প্রবেশ করতে কখনো বাধা দেননি। আর যখনই তিনি আমার দিকে তাকাতে, তখনই মুচকি হাসতেন।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩০৩৫) আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মানুষের সাথে সুন্দর ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়ে বলেন: "তোমরা মানুষের সাথে সুন্দর ও ভালো কথা বলো।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৩) কাউকে কষ্ট দিয়ে দান করার চেয়ে মুখে সুন্দর কথা বলা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রিয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নস্র কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা সেই দান (সাদাকাহ) অপেক্ষা উত্তম, যার পেছনে আসে কষ্টদায়ক আচরণ।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৩) কোরআনে নবীদের চমৎকার আচরণের উদাহরণ দিতে গিয়ে মুচকি হাসির উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হযরত সুলাইমান (আ.) যখন একটি পিঁপড়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি রেগে না গিয়ে বা বিরক্ত না হয়ে মায়াবী হাসি হেসেছিলেন: "তার কথা শুনে সুলাইমান মুচকি হাসলেন" (সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৯)

৪. পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো:

ইসলামে মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করা এবং পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (যেমন: পাথর, কাঁটা, ময়লা বা ক্ষতিকারক যেকোনো কিছু) সরিয়ে ফেলাকে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ এবং ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটি একাধারে একটি বড় ইবাদত এবং উত্তম সামাজিক দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "ঈমানের সত্তরটিরও বেশি (মতান্তরে ষাটেরও বেশি) শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) বলা এবং এর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি অঙ্গ।" (সহীহ মুসলিম: ৩৫)। হাদীসে আরো বলা আছে, "তোমার রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড় (বা কষ্টদায়ক বস্তু) সরিয়ে দেওয়াও তোমার জন্য একটি সাদকাহ।" (জামে আত-তিরমিযী: ১৯৫৬)। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের একটি বিখ্যাত হাদীসে এসেছে: "এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি কাঁটায়ুক্ত ডাল দেখতে পেল এবং সেটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজটি কবুল করলেন এবং তার পাপ ক্ষমা করে দিলেন।" (সহীহ বুখারী: ২৪৭২, সহীহ মুসলিম: ১৯১৪) সুতরাং, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো কেবল দান নয় বরং পাপ মোচন ও জান্নাত লাভের উসিলাও হতে পারে ইন শা আল্লাহ।

৫. কাউকে সঠিক পথ দেখানো বা ভালো কোনো পরামর্শ দেওয়া:

ইসলামী পরিভাষায় একে 'আল-আশ-শুরা' (পরামর্শ) এবং 'নসীহত' (কল্যাণকামিতা) বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "দ্বীন হলো মূলত নসীহত বা কল্যাণ কামনা করা।" তাই কাউকে কোনো সংকটে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করা, পথ হারানো পথচারীকে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া কিংবা কোনো ভাইকে ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া—এসবই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত পুণ্যময় 'দান' বা সাদকা। পবিত্র কুরআনে মানুষকে ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া এবং সঠিক পথ দেখানোর নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন: "আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪)

"তোমরা সংকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো..." (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কাউকে পথ চেনানো বা ভালো পরামর্শ দেওয়া এক প্রকার দান। তিনি বলেন: "কোনো পথহারা মানুষকে পথ দেখিয়ে দেওয়া তোমার জন্য একটি সদকা (দান)।" (জামে আত-তিরমিযী: ১৯৫৬) অন্য একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "তোমার ভাইয়ের (মুখের) দিকে তাকিয়ে তোমার মৃদু হাসা এ:টি সদকা, তোমার ভালো কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি সদকা এবং পথ হারিয়ে ফেলা ব্যক্তিকে তোমার পথ দেখিয়ে দেওয়া একটি সদকা।" (জামে আত-তিরমিযী: ১৯৫৬) কাউকে ভালো পরামর্শ দিলে বা সঠিক পথ দেখালে, সেই ব্যক্তি আমল করার পর যে সওয়াব পাবে, পরামর্শদাতাও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ দেখাবে, সে ওই কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।" (সহীহ মুসলিম: ১৮৯৩) কাউকে দ্বীনের বা জীবনমুখী সঠিক জ্ঞান ও পরামর্শ দেওয়াকে অন্যতম সেরা দান বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "মুসলিম ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম সাদকাহ হলো, সে নিজে জ্ঞান লাভ করবে, তারপর তার অন্য মুসলিম ভাইকে তা শিক্ষা দেবে।" (সুনান ইবনে মাজাহ: ২৪৩)

৬.বিবাদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে আপস বা মীমাংসা করে দেওয়া।

ইসলামে দুই ব্যক্তি, পরিবার বা দলের মধ্যকার বিবাদ-মীমাংসা করে দেওয়া এবং তাদের মাঝে শান্তি স্থাপন করাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুণ্য ও সদকা (দান) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিবাদমান পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করাকে ঈমানদারদের দায়িত্ব এবং আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ থাকে না; তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সদকা, সংকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে মীমাংসা করার। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা করবে, তাকে আমি অবশ্যই মহা পুরস্কার দান করব।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৪) "নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০) রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বাণীতে স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষের মাঝে বিরোধ মিটিয়ে দেওয়া কেবল একটি ভালো কাজই নয়, এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার 'আর্থিক বা শারীরিক সদকা'র সমতুল্য। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "প্রতিদিন—যাতে সূর্য উদিত হয়—মানুষের প্রত্যেক জোড়ের (গ্রন্থির) জন্য সদকা দেওয়া আবশ্যিক। (তার মধ্যে একটি হলো) যদি তুমি দুজন (বিবাদমান) মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার ও মীমাংসা করে দাও, তবে তা একটি সদকা।" (সহীহ বুখারী: ২৭০৭, সহীহ মুসলিম: ১০০৯)। অন্য এক হাদিসে এসেছে, "আমি কি তোমাদের এমন একটি আমলের কথা বলব না, যা মর্যাদা ও সওয়াবের দিক থেকে নামায, রোযা ও সদকার (নফল) চেয়েও উত্তম?" সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, "তা হলো বিবাদমান দুজনের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া। কারণ, পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়াই দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়।" (জামে আত-তিরমিযী: ২৫০৯, সুনান আবু দাউদ: ৪৯১৯)

ইসলামি শরিয়াহ জনজীবনে সাদাকাহর পরিধিকে এতটাই সহজ ও বিস্তৃত করেছে যে, একজন দরিদ্র মানুষও টাকা-পয়সা ছাড়া প্রতিদিন প্রচুর সাদাকাহর সওয়াব পেতে পারে।

৩. ইসলামি শরিয়াহ ও জনজীবনে সাদাকাহর গুরুত্ব

ইসলামি শরিয়াহর দৃষ্টিতে সাদাকাহর গুরুত্ব:

ইসলামী শরীয়তে সাদাকা বা দান-সদকা মানুষকে আত্মকেদ্রিকতা ও সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত করে এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় নামাজের পাশাপাশি সাদাকাহ বা যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর বিনিময়ে বহুগুণ সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে, যা কখনও ধ্বংস হবে না" (সূরা ফাতির: ২৯-৩০)। বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে দান করলে সম্পদ কমে যায়, কিন্তু শরিয়াহর দৃষ্টিতে সাদাকাহ সম্পদকে বারাকাহময় ও বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সাদকাহকে বর্ধিত করেন।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৬)। আল্লাহ আরো বলেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের মতো, যা থেকে সাতটি শিষ বের হলো এবং প্রতিটি শিষে একশত করে দানা রয়েছে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন..." (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬১) রাসূলুল্লাহ (সা.) কসম করে বলেছেন: "সাদকা করার কারণে কোনো বান্দার সম্পদ কমে না।" (জামে আত-তিরমিযী)

সাদাকাহ ঈমানের সত্যতার প্রমাণ এবং একটি কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। ইসলামি আইন ও বিধানে (শরিয়াহ) সাদাকাহকে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অংশ এবং সাদাকাহ হলো (ঈমানের) দলিল বা প্রমাণ।" (সহীহ মুসলিম: ২২৩)

পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে দেয়, সাদাকাহ তেমনি মানুষের পাপকে মিটিয়ে দেয়। গোপন সদকা আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে। এছাড়াও হাশরের ময়দানে যখন সূর্যের উত্তাপে মানুষ দিশেহারা হবে, তখন মুমিনের দান তার জন্য ছায়া হয়ে দাঁড়াবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "কেয়ামতের দিন মানুষ বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার দেওয়া সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।" (মুসনাদে আহমাদ)। "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৪)।

জনজীবন ও সমাজে সাদাকাহর গুরুত্ব:

১) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ: সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনতে সাদাকাহ বড় ভূমিকা পালন করে। ধনীদের উদ্ধৃত অর্থ যখন সাদাকাহর মাধ্যমে দরিদ্রদের হাতে পৌঁছায়, তখন সমাজে পুঁজি কেবল এক জায়গায় স্থবির হয়ে থাকে না, বরং সচল হয়।

২) সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন: সমাজের বিধবা, এতিম, পঙ্গু ও কমহীন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাদাকাহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে কাজ করে। ইসলামে আর্থিক দানের পাশাপাশি কাউকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া, ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করাও বড় সাদাকাহ, যা জনজীবনকে স্বাবলম্বী করে তোলে।

৩) হিংসা ও অপরাধ প্রবণতা হ্রাস: দরিদ্র মানুষ যখন দেখে ধনীরা তাদের বিপদে এগিয়ে আসছে, তখন ধনীদের প্রতি তাদের মনে ক্ষোভ বা হিংসা থাকে না; বরং ভালোবাসা তৈরি হয়। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে কমে যায়।

৪) পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি: সাদাকাহ মানুষের মন থেকে কৃপণতা ও স্বার্থপরতা দূর করে সহানুভূতিশীল করে তোলে। এর ফলে সমাজে পারস্পরিক ঐক্য, শান্তি ও সম্প্রীতির এক চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়।

সাদাকাহ যেমন পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি, তেমনি জনজীবনে তা শান্তি ও সাম্যের প্রতীক। সাদাকাহর মাধ্যমে সমাজ থেকে অভাব ও বৈরিতা দূর হয় এবং একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও মানবিক সমাজ গড়ে ওঠে। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী ছোট-বড় যেকোনো সৎকাজের মাধ্যমে সাদাকাহর অভ্যাস করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

৪. স্পিরিচুয়াল প্রোডাক্টিভিটি: আধুনিক গবেষণার আলোকে সাদাকাহ্

স্পিরিচুয়াল প্রোডাক্টিভিটি কি তা বলার আগে বারাকাহ্ নিয়ে জেনে নিই। বারাকাহ্ হলো 'স্পিরিচুয়াল প্রোডাক্টিভিটির' মূল ভিত্তি। এটি পরিমাপযোগ্য না হলেও এটিকে অনুভব করা যায়। এ যুগে বারাকাহ্ যেন এক হারানো রত্ন; প্রত্যেকেই যার সন্ধান করছে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা পাচ্ছে না। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন চালাতে পারলেই আমরা বারাকার সৌভাগ্য লাভ করতে পারব। মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো জীবনধারা মেনে জীবন পরিচালনা করলে, সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবে, এই যোগসূত্রই হলো স্পিরিচুয়াল প্রোডাক্টিভিটি। এভাবেই অর্জন করা যায় চূড়ান্ত সফলতা, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই। আর সেই চূড়ান্ত সফলতার ঘরে পৌঁছতে কর্মশক্তি, ফোকাস ও সময়-সুযোগ লাভ করা যায়।

স্পিরিচুয়াল এনার্জি কি? এটি এমন এক শক্তি যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে লাভ করা যায়। যত বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হবো, তত বেশি কর্মশক্তি অর্জন করবো। আল্লাহর নির্দেশ আঁকড়ে ধরা এবং রাসূলের নির্দেশনার অনুসরণ করামাত্রই দেহে একধরনের বাড়তি কর্মক্ষমতা সৃষ্টি হবে। অভাবনীয় সব জিনিস অর্জনে এই এনার্জি আপনার জন্য হয়ে উঠবে এক মহাচালিকাশক্তি। আবার প্রোডাক্টিভিটি ও স্পিরিচুয়ালিটির মধ্যে একটি সংযোগ হলো "বারাকাহ্"।

এবারে বিশ্লেষণ করা যাক সাদাকাহর কনসেপ্ট কীভাবে বারাকাহর উৎস হতে পারে।

সাদাকাহ হতে পারে অর্থ, শরীর, দক্ষতা, সম্পর্ক: এমনকি মুখের হাসিও!

'হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদাকাস্বরূপ। তোমার সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সাদাকাস্বরূপ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেওয়া তোমার জন্য সাদাকাস্বরূপ। স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেওয়া তোমার জন্য সাদাকাস্বরূপ। পথ হতে পাথর কাঁটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদাকাস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেওয়াও তোমার জন্য সাদাকাস্বরূপ।' [জামে আত-তিরমিজি]

সাম্প্রতিক গবেষণার দৃষ্টান্ত থেকে এ ধারণা পাওয়া যায়:

- ১) যে সকল শিক্ষার্থী দিনে পাঁচটি সহযোগিতামূলক কাজ করে, তারা অন্যদের তুলনায় বেশি আনন্দিত থাকে।
- ২) অন্যদের মানসিক সহায়তা করলে বয়স্কদের মধ্যে নির্দিষ্ট ধরনের কিছু ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হয়।
- ৩) 'ব্রেইন ইমেজিং' রিসার্চে দেখা গেছে-যে লোকেরা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ দান করেছিলেন, তাদের মস্তিষ্ক বেশ একটি ভালো উদ্দীপনা পেয়েছিল।[1]
- ৪) ড. সুজান রিচার্ডসের নেতৃত্বে 'A 2013 paper' ইউনিভার্সি অব এক্সিটার মেডিকেল স্কুলে স্বৈচ্ছাসেবী ও স্বাস্থ্যের মধ্যে যোগসূত্র নিয়ে গত ২০ বছর ধরে ৪০টি গবেষণা পর্যালোচনা করেছে। তারা দেখিয়েছে, স্বৈচ্ছাসেবা হতাশা কমায়ে, সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং আয়ু বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। [2]

জীবনে শক্তি ফিরে পাওয়ার দ্রুততম উপায় হলো, অন্যদের সাহায্যে অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করা।

Reference :

[1] Connect with Others. Mental Health America. Web. 10 Jan. 2016. <<http://www.liveyourlifewell.org/go/live-your-life-well/others>>

[2] Konrath, Sara, Sara Konrath Ph.D. "The Caring Cure: Can Helping Others Help Yourself? Psychology Today. 29 Aug. 2013. Web. 10 Jan. 2016.<<http://www.psychologytoday.com/blog/the-empathy-gap/201308/the-caring-cure-can-helping-oters-help-yourself>>

৫. সোশ্যাল প্রোডাক্টিভিটি: সাদাকাহ শ্রেষ্ঠ উম্মাহর দায়িত্ব

সোশ্যাল প্রোডাক্টিভিটি মানে কী?

সহজ করে বললে, শুধু নিজের জন্য না ভেবে, অন্যদের জন্যও কিছু করা। নিজের সময়, জ্ঞান, দক্ষতা বা শ্রম দিয়ে আশেপাশের মানুষের কাজে লাগা। এটা হতে পারে বাসায় পরিবারকে একটু সাহায্য করা, কোনো সামাজিক কাজে হাত লাগানো, বা এমন কোনো আন্দোলনে যোগ দেওয়া যেটা আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। মোটকথা, এর মূল কথাটা হলো সাদাকাহ।

মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্বটা আসলে অনেক বড়।

আমাদের উচিত এই সোশ্যাল প্রোডাক্টিভিটিতে সবার আগে থাকা। পরিবার থেকে শুরু করে প্রতিবেশী, এলাকা, উম্মাহ, সবার জন্য কিছু না কিছু করা। কিন্তু বাস্তবতা একটু কষ্টের। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মুসলিম, অথচ সমাজ বদলানোর কাজে আমাদের উপস্থিতি খুবই কম। মুসলিমদের বড় বড় সংগঠন কোথায়? পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে কাজ করা মানুষগুলো কোথায়?

আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করি যে আমরা সেরা উম্মাহ, তাহলে সেটা প্রমাণ করতে হবে কাজে, কথায় না।

ইসলাম কিন্তু এটাই বলে। ইসলাম কখনো শুধু "নিজে ভালো থাকো" বলেনি। দৈনন্দিন জীবনে অন্যদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বারবার এসেছে। ইসলামের রীতিনীতিগুলো ভালো করে দেখলেই বোঝা যায়, এগুলো একা একা পালন করার জন্য না, বরং মিলেমিশে, সমাজ হিসেবে একসাথে চলার জন্য।

নবিজি যখন প্রথমবার মদিনায় পৌঁছান, মানুষদের বলা তাঁর প্রথম কথাগুলোর মধ্যে একটি ছিল- "তোমরা ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়াও, সালামের প্রসার করো, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো এবং অন্যরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সালাত পড়ো। এগুলোর মাধ্যমে তুমি শান্তিময় জাহাাতে প্রবেশ করতে পারবে।" [সহিহ বুখারি]

খেয়াল করুন, এর তিনটি পয়েন্টই ছিল সামাজিক কাজ সম্পর্কে। শুধু শেষেরটি ছিল ব্যক্তিগত ইবাদত প্রসঙ্গে। আল্লাহ নবিজির উম্মতকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে অভিহিত করেছেন, তার দুটোই হচ্ছে অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। আল্লাহ কুরআনে বলেন- "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, যাদের বের করা হয়েছে মানবজাতির জন্য; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত, তবে তা ছিল তাদের জন্য ভালো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।" [সূরা আলে ইমরান: ১১০]

সোশ্যাল এনার্জিঃ

একটি উদ্দীপনাদায়ক পরিবেশে অন্য মানুষদের সাথে সময় ব্যয় করলে তখন আমাদের মধ্যে একটা সোশ্যাল এনার্জি আসে। একটি কাজ মিলেমিশে করলে কাজটি কতটা উত্তেজনার বা বিরক্তির সেটি বিষয় না। দলগতভাবে কাজ করতে গিয়ে যে শক্তিটি অনুভব করা যায়, সেটি আমাদেরকে অনেক দিন গতিশীল রাখে। সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী আচরণ এবং নিজের সবকিছু করতে গিয়ে ক্লান্তিবোধ করলে প্রোডাক্টিভিটি হ্রাস পায়। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে বন্ধুকে ফোন করা, নতুন কোনো সম্ভাবনাময় ক্লায়েন্ট পরিদর্শন করতে যাওয়া

অথবা টিমের সাথে অনলাইন মিটিং করা-এ জাতীয় কাজগুলোতে নিয়মিত অংশ নেয়া যায়। এভাবে নতুন করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার উত্তেজনা এবং প্রাণশক্তি ফিরে পাবো। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী উভয়ের জন্যই সোশ্যাল এনার্জির প্রয়োজন। তবে সর্বসম্মতিক্রমে অন্তর্মুখীরা কম প্রয়োজন বোধ করে। আরও অধিক প্রোডাক্টিভিটি ও সোশ্যাল এনার্জি লাভের জন্য এটি আসলে অন্তর্মুখী লোকদের জন্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তারা নিজেদের এ জাতীয় শক্তির প্রয়োজনে কম সংবেদনশীল হতে পারে।

কিন্তু সোশ্যাল এনার্জি নিয়ন্ত্রণে সচেতন না হলে উদ্দীপনাদায়ক পরিবেশ থেকে সরে গিয়ে এমন সব লোকদের পরিবেশে পৌঁছে যাবেন, যারা আপনাকে প্রোডাক্টিভ প্রজেক্ট থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

নিয়মিত সোশ্যাল এনার্জি লাভে সাদাকাহ এর প্রভাব:

১) প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় হতে অনুপ্রেরণা:

নবিজি আমাদের কেবল প্রতিবেশীদের ক্ষতি করা থেকেই বিরত থাকতে বলেননি; বরং তিনি তাদের প্রতি সদয় হওয়ার উপায় বের করতেও উৎসাহিত করেছেন। আবু জর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-"হে আবু জর, তুমি তরকারি রান্না করলে তাতে পানি (শুরুয়া বা ঝোল) বেশি দিয়ে এবং তোমার প্রতিবেশীকে কিছু দিয়ে।" [সহিহ মুসলিম: ৬৫৮২]

২) আমন্ত্রণ গ্রহণ, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং জানাজায় যেতে উৎসাহ:

ইসলাম সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণে আমাদের উৎসাহিত করে।

যেমন: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-"মুসলিমের প্রতি মুসলিমের হক ছয়টি। জিজ্ঞেস করা হলো-সেগুলো কী, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, ১. কারও সাথে তোমার দেখা হলে তাকে সালাম করবে, ২. তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩. তোমার নিকট ভালো উপদেশ চাইলে তুমি তাকে ভালো উপদেশ দেবে, ৪. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জন্য তুমি (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) রহমতের দুআ করবে, ৫. পীড়িত হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬. সে মৃত্যুবরণ করলে তার (জানাজার) সাথে যাবে।" [সহিহ মুসলিম: ৫৫৪৪]

৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য উৎসাহ:

ঐতিহ্যগত 'বড়ো পরিবার কাঠামোর ভাঙন; অন্য শহর ও দেশে মুসলিমদের অভিবাসনে আমরা আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। দুঃখজনকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছি। ইসলাম বিশেষভাবে প্রত্যেককে তার পরিবারের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি এবং তা বজায় রাখতে জোর ত্যাগ দেয়। নবিজি বলেছেন-" 'আর-রহম' শব্দটি 'আর-রহমান' নামটি থেকে উৎসারিত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও সে লোক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব।" [সহিহ বুখারি, আধুনিক প্রকাশনী: ৫৫৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৫৪৪৯]

৬. দানশীলতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম

ইসলামের ইতিহাসে দানশীলতার সবচেয়ে দেদীপ্যমান ও অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর মহান সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের দানশীলতা কেবল উদ্বৃত্ত সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নিজের চরম অভাব ও ক্ষুধার সময়েও অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দেওয়ার এমন অবাস্তব মনে হওয়া সব দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন, যা মানব ইতিহাসে বিরল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের দানশীলতার উজ্জ্বল কিছু দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হলো:

রাসূলের সাদাকাহ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। রমজান মাস এলে তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেগবান হয়ে উঠত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কিছু চেয়ে কেউ কখনো 'না' শব্দ শোনেনি। এক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা ভর্তি ছাগল চাইল। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে সব দিয়ে দিলেন। লোকটি তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, কারণ মুহাম্মদ এমনভাবে দান করেন যে তাঁর আর দারিদ্র্যের কোনো ভয় থাকে না।" (সহীহ মুসলিম: ২৩১২) একবার এক নারী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বুনাতি একটি সুন্দর চাদর উপহার দিলেন, যার খুব প্রয়োজন তাঁর ছিল। তিনি সেটি পরিধান করে বাইরে এলে এক সাহাবী বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! চাদরটি কতই না সুন্দর, এটি আমাকে দিয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে গিয়ে চাদরটি ভাঁজ করে তাকে পাঠিয়ে দিলেন। নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতেন না। (সহীহ বুখারী: ২০৭৩)

মৃত্যুশয্যায়ও দানের চিন্তা করতেন রাসূল (সা:)। ওফাতের পূর্বে চরম অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) মা আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ঘরে রক্ষিত কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার কথা। তিনি বললেন, "মুহাম্মদের পরিবার আল্লাহর সাথে কীভাবে সাক্ষাৎ করবে যদি তার ঘরে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো থেকে যায়? এগুলো এখনই দান করে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ)

সাহাবিদের সাদাকাহ

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবন ছিল আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে দান ও সাদাকাহর অতুলনীয় নজির। নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যকে, বিশেষ করে গরীব ও বঞ্চিতদের প্রাধান্য দেওয়া ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র সংস্পর্শে এসে সাহাবায়ে কেরাম দানের ক্ষেত্রে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। সাহাবাদের জীবনের সাদাকাহর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলো:

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর অকাতর দান: তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র এবং সম্পদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে তুলে দেন। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন, "পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।"

কেবল তাবুক যুদ্ধেই নয়, ইসলামের শুরুর দিন থেকেই আবু বকর (রা.) তাঁর ধন-সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মক্কার কাফেররা যখন ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে দুর্বল ও অসহায় ক্রীতদাসদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাত, তখন আবু বকর (রা.) নিজের পকেটের টাকা দিয়ে চড়া মূল্যে তাদের কিনে মুক্ত করে দিতেন।

ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রা.), আমার ইবনে ফুহাইরাহ (রা.) সহ বহু সাহাবীকে তিনি নিজের অর্থ ব্যয় করে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছিলেন। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় সমস্ত খরচ ও সওয়ারির উট হযরত আবু বকর (রা.) নিজের অর্থ দিয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত আবু বকরের এই নিঃস্বার্থ দান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই বলেছেন:

"আমি যার সঙ্গেই নেক আচরণ করেছি, সে-ই তার প্রতিদান আমাকে দিয়েছে (বা আমি শোধ করেছি); কেবল আবু বকর ছাড়া। তার আমার ওপর এমন কিছু এহসান বা অনুগ্রহ রয়েছে, যার প্রতিদান কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ স্বয়ং তাকে দেবেন। আর আবু বকরের সম্পদ আমাকে যতটুকু উপকার দিয়েছে, অন্য কারো সম্পদ আমাকে ততটুকু উপকার দেয়নি।" (জামে আত-তিরমিযী: ৩৬৬১)। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর এই দানশীলতা কোনো লোকদেখানো বিষয় ছিল না, বরং তা ছিল সম্পূর্ণ লৌকিকতাহীন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। এ কারণেই ইসলামের ইতিহাসে তিনি 'সিদ্দিক' (মহা-সত্যবাদী) এবং দানের সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

হযরত উমর (রা.)-এর অর্ধেক সম্পদ দান: একই যুদ্ধের সময় হযরত উমর (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর পথে সাদাকাহ করে দেন। তিনি ভাবলেন, দানের ক্ষেত্রে আজ তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে ছাড়িয়ে যাবেন। কিন্তু পরে জানতে পারলেন আবু বকর (রা.) তাঁর সবটুকু নিয়ে এসেছেন। তখন উমর (রা.) আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমি কোনোদিন কোনো ভালো কাজে আবু বকরের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারব না।" হযরত উমর (রা.) কেবল সংকটকালেই দান করেননি, বরং তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান এবং প্রিয় সম্পদটিও আল্লাহর রাস্তায় চিরতরে উৎসর্গ করেছিলেন। খাইবার যুদ্ধের পর উমর (রা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে খাইবারে একটি চমৎকার ও উর্বর খেজুর বাগান লাভ করেন। জমিটি এত সুন্দর ছিল যে, এটিই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান এবং প্রিয় সম্পত্তি। উমর (রা.) এই জমি পাওয়ার পর সোজা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে চলে গেলেন এবং পরামর্শ চাইলেন।

তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি খাইবারে এমন একটি চমৎকার জমি পেয়েছি, যা আমার কাছে আমার সমস্ত সম্পদের চেয়ে প্রিয়। এখন আপনি আমাকে এই জমিটি নিয়ে কী করার নির্দেশ দেন?" রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে চমৎকার একটি পরামর্শ দিয়ে বললেন: "তুমি ইচ্ছা করলে এর মূল মালিকানাটি (আসল জমিটি) নিজের নামে রেখে দিতে পারো (যা কখনো বিক্রি বা হস্তান্তর করা যাবে না) এবং এর থেকে উৎপাদিত ফসল বা লভ্যাংশ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতে পারো।" রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই পরামর্শ পেয়ে হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ জমিটি আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকফ করে দেন। তিনি শর্ত জুড়ে দেন যে—এই জমি কখনো বিক্রি করা যাবে না, কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে এর মালিক হতে পারবে না এবং কেউ তা কাউকে উপহারও দিতে পারবে না। এর সমস্ত আয় ও ফলমূল দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্তি, মুসাফির, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ এবং মেহমানদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। (সহীহ বুখারী: ২৭৩৭, সহীহ মুসলিম: ৪২২৯)।

হযরত উসমান (রা.)-এর 'রুমাহ' কূপ ক্রয়: মহাসংকটে একচ্ছত্র ত্রাণকর্তা ইসলামের ইতিহাসে হযরত উসমানের দানশীলতা ছিল প্রবাদতুল্য। মদিনায় পানির তীব্র সংকট দেখা দিলে হযরত উসমান (রা.) অনেক চড়া মূল্যে ইহুদির কাছ থেকে 'রুমাহ' নামক কূপটি কিনে তা সাধারণ মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ বা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাবুক যুদ্ধে সাহাবীদেরকে দানের আহ্বান জানানলেন, তখন হযরত উসমান (রা.) যে অভূতপূর্ব দান করেছিলেন, তা দেখে স্বয়ং রাসূল (সা.) বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা.) একাই যুদ্ধের মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ জোগান দেন। তিনি দান করেছিলেন:

৯৫০টি সুসজ্জিত উট, ৫০টি উন্নত জাতের ঘোড়া, ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা (দিনার), যা তিনি নিজের কাপড়ে করে এনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোলে ঢেলে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) পরম তৃপ্তিতে তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো নাড়াচাড়া করছিলেন এবং বারবার বলছিলেন: "আজকের পর থেকে উসমান যা-ই করুক না কেন, তার কোনো কিছুই আর তার ক্ষতি করতে পারবে না (অর্থাৎ আল্লাহ তার ওপর চিরতরে সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন)।" (জামে আত-তিরমিযী: ৩৭০১, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.): তিনি ছিলেন মদিনার অন্যতম ধনী সাহাবী এবং তাঁর দান ছিল অকল্পনীয়। তিনি তাঁর ব্যবসার সমস্ত মুনাফা এবং পণ্য কাফেলা আল্লাহর পথে সদকা করে দিতেন এবং ব্যবসার অর্জিত সম্পদ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। একবার তাঁর সাতশত উটের একটি বিশাল বাণিজ্যিক কাফেলা মদিনায় প্রবেশ করলে পুরো মদিনায় শোরগোল পড়ে যায়। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই কাফেলার সমস্ত মালসামান, উট ও খাদ্যশস্য মদিনার দরিদ্র ও অভাবী মানুষের মাঝে বিনামূল্যে বিলিয়ে দেন। তিনি শত শত দাস মুক্ত করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় হাজার হাজার দিনার এক লপ্তে দান করেছেন।

আনসার সাহাবীদের আত্মত্যাগ: মক্কা থেকে হিজরত করে আসা মুহাজির সাহাবীদের জন্য আনসার সাহাবীরা নিজেদের ঘরবাড়ি, জমিজমা এবং সম্পদের অর্ধেক ভাগ করে দিয়েছিলেন। এক রাতে এক ক্ষুধার্ত মেহমান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলে তিনি তাকে একজন আনসার সাহাবীর ঘরে পাঠালেন। ঘরে গিয়ে দেখা গেল খাবার সামান্যই আছে, যা কেবল শিশুদের জন্য যথেষ্ট। সেই সাহাবী ও তাঁর স্ত্রী এক চমৎকার বুদ্ধি করলেন। তারা বাতিটি মেরামতের বাহানায় নিভিয়ে দিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে মেহমানের সাথে নিজেরা খাওয়ার ভান করে বসে রইলেন, যাতে মেহমান পেট পুরে খেতে পারেন। তারা নিজেরা সপরিবারে উপোস রইলেন। তাদের এই ত্যাগ দেখে মহান আল্লাহ এতটাই খুশি হলেন যে, কুরআনের আয়াত নাজিল করলেন: "...এবং তারা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯)

এছাড়াও, হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.) সহ অনেক সাহাবী নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে অন্যের কাছে খাদ্য সাদাকাহ করেছেন, যা কুরআন ও হাদিসে প্রশংসিত হয়েছে। একবার হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সন্তানদের সুস্থতার জন্য হযরত আলী ও হযরত ফাতিমা (রা.) আল্লাহর দরবারে টানা তিনটি রোযা রাখার মানত করলেন। আল্লাহর রহমতে শিশুরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল এবং তাঁরা মানত পূরণের জন্য রোযা রাখা শুরু করলেন। সে সময় তাঁদের ঘরে কোনো খাবার ছিল না। হযরত আলী (রা.) এক ইহুদির খেত খামারে কাজ করে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু যব নিয়ে এলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) সেই যব পিষে রুটি তৈরি করলেন। প্রথম দিন সারাদিন রোযা রাখার পর মাগরিবের আজানের পর যখন তাঁরা ইফতার করতে বসলেন, ঠিক তখনই দরজায় এক অভাবী মিসকিন এসে আওয়াজ দিল, "হে নবী পরিবার! আমি একজন ক্ষুধার্ত মিসকিন, আমাকে কিছু খাবার দিন।" হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.) নিজেদের ইফতারের সমস্ত রুটি সেই মিসকিনকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা কেবল পানি দিয়ে ইফতার করে ঘুমিয়ে গেলেন।

পরের দিনও তাঁরা রোযা রাখলেন। ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত শরীরে ইফতারের সময় যখন আবারও বসা হলো, তখন দরজায় এক এতিম শিশু এসে বলল, "আমি একজন অসহায় এতিম, আজ সারাদিন কিছু খাইনি, আমাকে খাবার দিন।" তাঁরা দ্বিতীয় দিনও নিজেদের রাতের খাবার সেই এতিমকে দিয়ে দিলেন এবং আবারও শুধু পানি খেয়ে রাত কাটালেন। তৃতীয় দিনও রোযা রাখা হলো। টানা তিন দিন না খেয়ে থাকার কারণে তাঁদের শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে দরজায় একজন অমুসলিম যুদ্ধবন্দি এসে খাবারের জন্য আকুতি জানাল। ইসলামের মহানুভবতা ও ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁরা টানা তৃতীয় দিনও নিজেদের একমাত্র খাবার সেই বন্দির হাতে তুলে দিলেন। নিজেদের চরম ক্ষুধার সময়েও একজন মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ মহান আল্লাহ আরশের ওপর থেকে দেখছিলেন। তাঁদের এই লৌকিকতাহীন ও খাঁটি নিয়তের দানকে কিয়ামত পর্যন্ত আসা সমস্ত মানুষের জন্য আদর্শ বানাতে আল্লাহ তাআলা সূরা আদ-দাহর এর ৮ ও ৯ নম্বর আয়াত নাজিল করেন: "আর তারা আল্লাহর ভালোবাসায় (অথবা নিজেদের খাবারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও) অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদের খাবার দান করে।" (সূরা আদ-দাহর, আয়াত: ৮)। তাঁরা মুখে কিছু না বললেও তাঁদের অন্তরের যে নিয়ত ছিল, তা উল্লেখ করে পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেন: "(তারা মনে মনে বলে) আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের খাওয়াই। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, কোনো কৃতজ্ঞতাও চাই না।" (সূরা আদ-দাহর, আয়াত: ৯)

ঋণ মাফ করে দেওয়াও একধরনের সাদাকাহ। কাইস বিন সাদ বিন উবাদাহ ছিলেন প্রসিদ্ধ দানশীল ব্যক্তিদের একজন। তিনি একদা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর কিছু সাথি তাঁর সাথে দেখা করতে বিলম্ব করছিল। তিনি তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হলো যে, 'তারা তাঁর কাছে ঋণী হওয়ার কারণে লজ্জায় দেখা করছে না।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ এমন সম্পদকে লাঞ্ছিত করুন, যা ভাইদেরকে সাক্ষাৎ থেকে বারণ করে।' এরপর তিনি একজন ঘোষককে ডেকে ঘোষণা দিতে বললেন যে, 'যে কাইসের কাছে ঋণী আছে, সে ওই ঋণ থেকে মুক্ত।' এই ঘোষণার পর সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ সাক্ষাৎকারীদের ভিড়ের ফলে তার ঘরের দরজার কপাট ভেঙে গেল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের জীবন থেকে পাওয়া এই দানশীলতার শিক্ষা কেবল ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার গল্প নয়; এটি ছিল আল্লাহর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা এবং পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতিফলন। তাঁদের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলো আজীবন মানবজাতিকে স্বার্থপরতা ও কৃপণতা পরিহার করে মানবতার কল্যাণে নিজের সেরাটা বিলিয়ে দেওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে।

৭. রহমতের বসন্ত: মাহে রমাদান

রমজান মাস হচ্ছে একজন মুমিনের জন্য নেকি বা সাওয়াব অর্জনের বসন্তকাল। রমাদান মাস কেবল না খেয়ে থাকার নাম নয়; বরং এটি আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক মহোৎসব। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে রমাদান মাস আসার সুসংবাদ দিতেন; যেমন মুসনাদু আহমাদ ও সুনানু নাসাঈ-এর বর্ণনায় এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিদের সুসংবাদ দিয়ে বলতেন,

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حَرَّمَ

"রমাদান মাস তোমাদের নিকট চলে এসেছে, মুবারক মাস। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এই মাসের রোযা রাখা ফরজ করেছেন। এই মাসে জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ করে রাখা হয় এবং সমস্ত শয়তানকে বন্দি করা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তিকে এই মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়, সে সত্যিই বঞ্চিত।" [আহমদ, আল-মুসনাদ, ৭১৪৮; নাসাঈ, ২১০৬]

কিছু আলিম বলেছেন, 'এই হাদীসটি হলো রমাদান মাস সম্পর্কে একে অপরকে অভিনন্দন জানানোর ভিত্তি। আর কীভাবেই-বা মুমিনকে জান্নাতের দরজা খোলার ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হবে না? এবং গুনাহগারকে জাহান্নামের দরজা বন্ধের ব্যাপারে খোশখবর দেওয়া হবে না? আর গাফিলদেরকে কীভাবেই-বা সেই সময় সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হবে না, যখন শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়? সেই সময়ের সাথে কি আর কোনো সময়ের তুলনা হয়?

রমাদান মাস পর্যন্ত পৌঁছা এবং পুরা মাস জুড়ে রোযা রাখা, সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো অনুগ্রহ। এর উপর প্রমাণ বহন করে তিন ব্যক্তির সেই হাদীস, একবার বনু উজরাহ গোত্রের দুই ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (সা:) -এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত দ্বীনি আবেগী ও জিহাদপ্রিয় ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি এক যুদ্ধে শরিক হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। অপর ব্যক্তিটি তার পরেও আরও এক বছর বেঁচে ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি স্বাভাবিকভাবে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত তালহা (রা.) বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম সেই দুই ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত। তখন জান্নাত থেকে একজন ফেরেশতা বের হয়ে এসে যে ব্যক্তিটি পরে বিছানায় মারা গিয়েছিল, তাকে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। এরপর বের হয়ে শহীদ ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'তুমি এখন ফিরে যাও, তোমার সময় এখনো আসেনি।' সকালে তালহা (রা.) এই স্বপ্নের কথা অন্যান্য সাহাবিদের জানালে সবাই বেশ অবাক হলেন। কারণ ইসলামে শহীদের মর্যাদা সবার ওপরে, অথচ বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া ব্যক্তিটি শহীদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করল! বিষয়টি রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কান পর্যন্ত পৌঁছালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোন বিষয়ে অবাক হচ্ছে?" সাহাবিরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! প্রথম ব্যক্তিটি আল্লাহর রাস্তায় এত কঠোর চেষ্টা ও জিহাদ করে শহীদ হলো, অথচ অপর ব্যক্তিটি পরে মারা গিয়েও তার আগে জান্নাতে প্রবেশ করল?" তখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَلَيْسَ صَلَّى بَعْدَهُمَا كَذَا وَكَذَا صَلَاةً وَأُذْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ فَقَالَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا لَابْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“সে কি তাদের দুজনের পরে এত এত সালাত আদায় করেনি? রমাদান মাস পায়নি এবং তাতে সিয়াম পালন করেনি? সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তাদের মাঝে রয়েছে আসমান ও জমিন পরিমাণ দূরত্বের ব্যবধান।” [আহমদ,আল-মুসনাদ,১৪০৩;ইবনু মাজাহ,৩৯২৫।]

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, রমাদানের গুরুত্ব কতটুকু! যে ব্যক্তি রমাদান মাস পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত। আর যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেয়েও এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সে যেন সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের আখিরাতের জন্য এই মাসে পাথৈয় সংগ্রহ করতে পারে না, সে হলো নিন্দিত ও তিরস্কৃত। কত মানুষ আছে যারা আশা রাখে যে, এবার পুরা মাস জুড়ে রোযা রাখবে;সালাত আদায় করবে; দান সাদাকাহ করবে; কিন্তু তাদের আশা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। রমাদান মাস আসার আগেই তাদের ঠিকানা হয় কবরের অন্ধকারে।

৮. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রমাদানের মাহাত্ম্য

রমাদান মাসের আসল সৌন্দর্য ও গভীরতা লুকিয়ে আছে পবিত্র কুরআন এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহর মাঝে। কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলগুলো বিশ্লেষণ করলে রমাদানের যে অসীম মাহাত্ম্য ও মর্যাদা প্রকাশ পায়, তা নিচে তুলে ধরা হলো:

১) আল্লাহ তাআলা এই মাসটিকে নিজের বাণী নাজিলের জন্য মনোনীত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ بُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
"রমজান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী।" (সূরা আল-বাকার: ১৮৫)।

২) রোজাকে এই মাসে ফরজ করা হয়েছে, তার মূল রহস্য আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যেন তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করতে পারো।" (সূরা আল-বাকার: ১৮৩)

৩) রমাদানের বিধানের মাঝেই আল্লাহ বান্দার দোয়ার জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
"আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আমি তো নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার নির্দেশ মান্য করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" (সূরা বাকার, আয়াত: ১৮৬)

৪) এছাড়াও এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর তা হলো 'লাইলাতুল কদর'। এই রাতে ইবাদত করলে এক হাজার মাস (প্রায় ৮৩ বছর ৪ মাস) ইবাদত করার চেয়েও বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।। সূরা আল-কদরে আল্লাহ বলেন:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।" (সূরা আল-কদর: ৩)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরের রাতে ইবাদত করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী) এছাড়াও রমাদানের রোজা এবং রাতের সালাত (তারাবিহ) মানুষের অতীত জীবনের পাপ ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।

৫) পবিত্র কুরআনে রমাদান মাসকে মানবজাতির মুক্তির মাস এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের সময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রমাদান মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয় এবং আল্লাহর রহমতের জোয়ার বয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন রমজান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

৬) রমাদানে রোজাদারদের জন্য বিশেষ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জান্নাতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে, কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোজাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না..." (সহীহ বুখারী)

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন— সাওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি নিজে এর প্রতিদান দেবো। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার। যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ! অবশ্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়েও সুগন্ধি। রোজাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশি; যা তাকে খুশি করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সাওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।' (সহীহ বোখারি, হাদিস : ১৯০৪)

৭) এই মাসে যেকোনো ইবাদতের বহুগুণে সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব। রমজানের রোজাসহ সকল ইবাদত প্রভুর জন্যই এবং তিনিই তার সর্বোচ্চ প্রতিদান দেবেন। হাদিসের ভাষায়, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের সাওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তবে রোজা ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দেবো।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৮২৩)

৮) রমাদান হলো দোয়া কবুলের মাস। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "রমাদান মাসের প্রতি রাতে ও দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে বহু বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং প্রতি রাতে ও দিনে প্রত্যেক মুসলিমের একটি করে দোয়া কবুল করা হয়।" (সহীহ আল-জামি)

৯.রমাদানে ইবাদতের বহুগুণে সাওয়াব

রমাদান মাসে প্রতিটি ইবাদতের সাওয়াব অন্য মাসের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যা মুসলিমদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। রমাদানে ইবাদতের সাওয়াব বৃদ্ধি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ফরয ও নফল ইবাদতের সাওয়াব বৃদ্ধি:

হাদিসে এসেছে, রমজান মাসে যেকোনো নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরয ইবাদতের সমান সাওয়াব পাওয়া যায়। আর এই মাসে একটি ফরয ইবাদত আদায় করলে অন্য মাসের ৭০টি ফরয ইবাদতের সমান সাওয়াব দেওয়া হয় (বায়হাকী)।

২. সাওয়াবের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই:

সাধারণত যেকোনো ভালো কাজের সাওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:"বনি আদমের প্রতিটি আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি করা হয়... কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা রোজা একমাত্র আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" (সহীহ মুসলিম) অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর অসীম ভাণ্ডার থেকে রোজাদারকে কী পরিমাণ সাওয়াব দেবেন, তার কোনো হিসাব বা সীমা নেই।

৩. লাইলাতুল কদরের হাজার মাসের সাওয়াব:

এই পবিত্র মাসেই রয়েছে 'লাইলাতুল কদর' বা ভাগ্য রজনী। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:"লাইলাতুল কদর হলো হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আল-কদর: ৩) অর্থাৎ, এই একটি রাতে ইবাদত করলে ৮৩ বছর ৪ মাস একটানা ইবাদত করার চেয়েও বেশি সাওয়াব অর্জিত হয়।

৪.ওমরাহ করলে হাজার সমান সাওয়াব:

রমজান মাসে ওমরাহ পালনের ফজিলত সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:"রমজান মাসে ওমরাহ করা আমার সাথে হজ আদায় করার সমতুল্য।" (সহীহ বুখারী)

৫. গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি:

রমজানে শুধু সাওয়াব বৃদ্ধিই হয় না, বরং অতীতের সব গুনাহ মুছে ফেলার সুযোগ থাকে। হাদিস অনুযায়ী: যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রমাদানের রোজা রাখবে এবং রাতে তারাবিহর নামাজ পড়বে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় (বুখারী ও মুসলিম)। রমাদানের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন (ইবনে মাজাহ)।

১০.রমাদানে দানশীলতার অনন্য মর্যাদা

রমাদান একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মাস, যেখানে মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মনিবেদন প্রকাশের লক্ষ্যে রোজা পালন করে। এটি এমন এক পবিত্র সময়, যখন মুমিন ব্যক্তি তার আমলের প্রতিদান বহুগুণ বেশি পাওয়ার আশায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই মাসে ফরজ রোজার পাশাপাশি নফল ইবাদত, কোরআন তিলাওয়াত এবং সর্বোপরি দান-সাদাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ সুবর্ণ হয়। এই মাসের তাৎপর্য শুধুমাত্র রোজা রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি দান-সাদাকাহ ও সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমে মানবতার সেবা ও সহর্মিতার চর্চার এক অনন্য সুযোগ। রমাদানে দান ও সাদাকাহের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, কারণ এই মাসে আত্মিক পরিশুদ্ধি, আত্মসংযম এবং সমাজের অসহায় মানুষের প্রতি সাহায্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে, যা কখনও ধ্বংস হবে না"

لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

"যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।" (সূরা ফাতির: ২৯-৩০)।

হাদিসের আলোকে রমাদানে দানশীলতা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা এবং রমাদানে যখন জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি কল্যাণবাহী বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯২০)। নবুওয়াত পাওয়ার পর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দানশীলতা অন্যান্য মাসের তুলনায় রমাদান মাসে অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। কারণ তখন নবিজির সাথে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) সাক্ষাৎ করতেন, তিনি হলেন ফেরেশতাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান। এরপর তাঁরা উভয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন এবং আলোচনা করতেন, যা সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। যা দয়া করতে এবং উত্তম গুণাবলিতে গুণাশ্রিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। কুরআনই ছিল নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আখলাক। কারণ কুরআনের সন্তুষ্টিতেই তিনি সন্তুষ্ট, এর গোস্বায়ি তিনি রাগাশ্রিত। কুরআন যেসব বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে, তিনি সেসব বিষয়ের প্রতি দ্রুত ধাবিত হন আর যেসব বিষয়ে ধমকি এসেছে, সেগুলো থেকে দূরে থাকেন। এই কারণেই রমাদান মাসে নবিজির দয়া ও দানশীলতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেত। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাতের সময় নিকটবর্তী ছিল বলে এবং অধিক পরিমাণে এই সম্মানিত কিতাব পাঠ করা এবং শোনানোর বরকতে, যা উত্তম গুণাবলি ও দানশীলতার গুণে গুণাশ্রিত হতে উৎসাহ দেয়।

রাসূল (সা.) উম্মতকেও এ মাসে দান ও বদান্যতার হাত সম্প্রসারিত করতে শিখিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যারা গোপনে দান করবে, আল্লাহতায়াল্লা কেয়ামতের দিন তাদের আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন।' (বুখারি : ৬৬০)

রমাদানে সাদাকাহ করা ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূল বারংবার জোর দিয়েছেন। এই মাসে সাদাকাহ সহ যেকোনো ভালো কাজের বহুগুণে সাওয়াব পাওয়া যায় বলে, রমাদানে সাদাকাহর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

১১.রমাদানের সাদাকাহ: আল্লাহর গুণ ও রাসুলের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ 'আল-জাওয়াদ' বা অতি দানশীল। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পরম দাতা। হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দানশীল এবং তিনি দানশীলতাকে পছন্দ করেন। তবে আল্লাহর দানশীলতা কিছু নির্দিষ্ট সময়ে বহুগুণে বেড়ে যায়; যেমন: রমাদান মাসে। আল্লাহ রমাদানে তাঁর রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। রমাদানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের আমলের সওয়াব বহুগুণে বাড়িয়ে দেন, যা তাঁর অসীম উদারতারই বহিঃপ্রকাশ। মুমিন যখন এই মাসে দান করে, তখন সে মূলত আল্লাহর এই মহান গুণেরই অনুকরণ করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তায়ালা নবি (সা:)-কে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও সম্মানিত আখলাকের ওপর সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে তা দিয়েই তাঁর বান্দাদের নিকট প্রেরণ করেছেন; যেমন আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবি (সা:) বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি উত্তম আখলাককে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

সুতরাং নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক দানশীল। তাঁর দানশীলতা সব দিক জুড়েই প্রসারিত ছিল; ইলম ও সম্পদ খরচ করা, আল্লাহর দীন প্রচার করতে এবং তাঁর বান্দাদের সঠিক পথ দেখাতে শারীরিক পরিশ্রম করা এবং তাদের উপকার করা যেমন: ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো, মূর্খদের নসীহত করা, অভাবগ্রস্তদের অভাব পূরণ করা, তাদের বোঝা বহন করা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম দানশীল। নবি (সা:) শৈশব থেকেই এই সমস্ত প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন, এই কারণেই নবুওয়াতপ্রাপ্তির শুরুতে খাদীজা (রা:) বলেছিলেন,

كَأَنَّ اللَّهَ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّجَمَ، وَتَحْمِلَ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَغْدُومَ وَتَقْرَى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

"আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়-গরিবদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং প্রকৃত দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করেন।" [বুখারি-৩; মুসলিম-১৬০]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ

"রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব মানুষের চেয়ে সুন্দর ছিলেন, সবার চেয়ে দানশীল ছিলেন এবং সবার চেয়ে সাহসী ছিলেন।" [বুখারি-২৬২৭; মুসলিম-২৩০৭] সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, সফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে যা দান করার, তা-ই দান করেছেন। তিনি আমার নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঘণিত ব্যক্তি ছিলেন। এরপর তিনি আমাকে দান করতেই থাকেন, অবশেষে তিনি এখন আমার নিকট সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয়।' ইবনু শিহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হনাইনের যুদ্ধের সময় একশটি উট দান করেন, এরপর আরও একশটি দান করেন, এরপর আরও একশটি দান করেন।' সহীহ বুখারি-এর বর্ণনায় এসেছে, জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা:) থেকে বর্ণিত, 'কিছু বেদুইন সাহাবি হনাইন থেকে ফিরার পথে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং তাঁর কাছে চায় তিনি যেন তাদের মাঝে (সম্পদ) বণ্টন করে দেন। তখন নবীজি বলেন, "আমার নিকট যদি এই সব কাঁটাদার গাছের সমপরিমাণ উটও থাকত, তা হলেও এর সবই তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। তারপরও তোমরা আমাকে কৃপণ ও কাপুরুষ হিসেবে পেতে না।"

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দানশীলতার পুরাটাই ছিল আল্লাহর জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য। কারণ তিনি সম্পদ ব্যয় করতেন হয়তো ফকীরের জন্য অথবা কোনো অসহায় ব্যক্তির জন্য অথবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেন অথবা সেই ব্যক্তির জন্য খরচ করতেন, যার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিপ্রাপ্ত হয়।

আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দানশীলতা অন্যান্য মাসের চেয়ে রমাদান মাসে অনেকগুণ বেড়ে যেত, যেমন তখন আল্লাহ তাআলার দানও অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেড়ে যায়। কারণ আল্লাহ তাআলা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিজের পছন্দনীয় উত্তম আখলাকের ওপর সৃষ্টি করেছেন আর এজন্য নবিজি নুবুওয়াত পাওয়ার আগে থেকেই উত্তম আদব-আখলাকের অধিকারী ছিলেন।

রমাদান এলে তাঁর এই দানশীলতা কোনো সীমানা মানত না। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে এই মাসে অধিক পরিমাণে দান-সদকা করতেন এবং এই বিষয়ে সাহাবাদেরও উৎসাহিত করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা। রমাদানে যখন জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরও অধিক দানশীল হয়ে যেতেন... জিবরাঈল (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) কল্যাণবাহী বাতাসের (বৃষ্টিবাহী বায়ু) চেয়েও বেশি দানশীল হতেন।" (সহিহ বুখারি: ১৯০২)। কেন বাতাসের সাথে তুলনা? এর অর্থ হলো, বৃষ্টিবাহী বাতাস যেমন কোনো বাছবিচার ছাড়াই সর্বত্র শান্তি ও শীতলতা পৌঁছে দেয়, রাসূল (সা.)-এর দানও তেমনি ছোট-বড়, চেনা-অচেনা সবার কাছে অতি দ্রুত পৌঁছে যেত। রমাদান মাসে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দানশীলতা বিশেষভাবে বেড়ে যাওয়ার মধ্যে অনেক ফায়দা ও হিকমাহ লুকিয়ে রয়েছে; তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সমস্ত মাসের চেয়ে রমাদান মাস শ্রেষ্ঠ এবং এই মাসে আমলের সাওয়াব অনেকগুণ বেড়ে যায়।

২. ইবাদাত-বন্দেগি করার ক্ষেত্রে সিয়াম পালনকারী, রাত জেগে ইবাদাতকারী এবং যিকরকারীদের সাহায্য করা। ফলে সাহায্যকারীদেরও তাদের মতো সাওয়াব অর্জিত হয়। যেমন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের সামান্য প্রস্তুত করে দেয়, সে-ও জিহাদ করার মতো সাওয়াব লাভ করে, এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবারের দেখাশুনা করে, সে-ও জিহাদ করা মতো সাওয়াব লাভ করে। যাইদ ইবনু খালিদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে, তার জন্যও সিয়াম পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে; সিয়াম পালনকারীর সাওয়াব থেকে কোনোকিছু হ্রাস করা ছাড়াই।"

৩. রমাদান মাসে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানের মাধ্যমে আপন দানশীলতার প্রকাশ ঘটান। বিশেষ করে কদরের রাতে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু, তাদের প্রতি দয়া করেন; যেমন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَفَاءَ

"আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু, কেবল তাদের প্রতিই দয়া করেন।"

সুতরাং যারা আল্লাহর বান্দাদের ওপর দয়া করে, আল্লাহ তাআলাও তাদের ওপর আপন অনুগ্রহ, রহমত ও আমলের অধিক প্রতিদান দেওয়ার মাধ্যমে দয়া করেন।

৪. রোযা রাখার পাশাপাশি দান-সদাকা করার দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়; যেমন আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"নিশ্চয় জান্নাতে এমন অনেকগুলো ঘর রয়েছে, যেগুলোর ভেতর থেকে বাহির দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতর দেখা যাবে।" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'এগুলো কার জন্য, ইয়া রাসূলুল্লাহ?' নবিজি বললেন, "তাদের জন্য, যারা উত্তম কথা বলে, খাবার খাওয়ায়, সব সময় রোযা রাখে এবং লোকজন যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে, তখন তারা সালাত আদায় করে।" (তিরমিজি ২৫২৭)। রমাদান মাসে এই সমস্ত গুণাবলি অনুসারে আমল করা খুব সহজ; এই মাসে মুমিনের জন্য একত্র হয় সিয়াম, কিয়ামুল লাইল, দান-সদাকা এবং উত্তম কথা বলা। কারণ এই মাসে সিয়াম পালনকারীকে অনর্থক কাজকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর সিয়াম, সালাত ও সদাকা বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

৫. সিয়াম ও সদাকার গুণ একত্রিত হলে গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেওয়া, জাহান্নাম থেকে বাঁচা এবং তা থেকে দূরে থাকা পরিপূর্ণতা পায়। বিশেষ করে এর সাথে যদি কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের সালাত) যুক্ত হয়।

৬. রোযার মধ্যে ত্রুটি ও কমতি চলেই আসে; আর রোযার মাধ্যমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া একটি শর্তের সাথে যুক্ত। আর তা হলো রোযাকে যথাযথভাবে হেফাজত করা। যেভাবে হেফাজত করা উচিত, অধিকাংশ মানুষের রোযা সেভাবে হেফাজত হয় না। তাই দান-সদাকা রোযার মধ্যে যে ত্রুটি ও কমতিগুলো আসে তা দূর করে দেয়। এই কারণেই রমাদান মাসের শেষে সদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব, যা রোযাকে অনর্থক ও অশ্লীলতার ত্রুটি থেকে পবিত্র করে।

৭. রোযাদার ব্যক্তি খাওয়া ও পান করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করে, সুতরাং সে যখন অন্যান্য রোযাদার ব্যক্তিদের খাবার খাওয়াবে এবং পান করাবে, তখন সে ওই ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করবে, যে আল্লাহর জন্য নিজের চাহিদা পরিত্যাগ করে এবং অন্যকে প্রাধান্য দেয় অথবা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এই কারণে রোযাদার ব্যক্তির জন্য এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যখন সে ইফতার করবে, তার সাথে যেন অন্যান্য রোযাদারদেরও ইফতার করায়। কারণ সেই সময় খাবার তার কাছে অধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকে, ফলে অন্যের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হতে পারবে; অবশেষে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যারা নিজের পছন্দনীয় বস্তু অপরকে খাওয়ায়। আর এতে আল্লাহ তাআলা তার জন্য খাবার ও পানীয় নিষেধ করার পর আবার যে বৈধ করে দিয়েছেন, সেই নিয়ামাতেরও শুকরিয়া আদায় করা হবে। কারণ তা অনেক বড়ো নিয়ামাত। আসলে কোনো নিয়ামাতের প্রকৃত মর্যাদা তখনই উপলব্ধি হয়, যখন তা থেকে বঞ্চিত থাকা হয়।

রমাদানে একজন মুমিন যখন দান করে, সে আসলে তার রবের গুণের প্রতিফলন ঘটায় এবং তার প্রিয় নবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ সুন্নাহটি পালন করে। এটি কেবল অর্থ ব্যয় নয়, বরং নিজের আত্মাকে আল্লাহর রঙে রাঙানোর একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া।

১২. স্বল্প দানে মহাপুরস্কার: পরকালীন মুনাফার সমীকরণ

রমাদান হলো আত্মশুদ্ধির মাস, সংযম ও ইবাদতের মাস। এই মাসে ইবাদতের মাধ্যমে যেমন অধিক সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি দান-সদকার প্রতিদানও পাওয়া যায় বহুগুণে। তাই রমাদানে দান-সদকার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। সাদাকাহ দানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, যা আখিরাতে প্রতিদান হিসেবে বহুগুণে ফেরত আসে।

রমাদানের সাদাকাহকে আমরা একটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখতে পারি। আমরা যেমন কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে যাচাই করি কোথায় এবং কোন সময়ে বিনিয়োগ করলে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা যাবে, ঠিক তেমনিই, সাদাকাহ করার সময় আমরা বিবেচনা করতে পারি, কখন এবং কোন খাতে ব্যয় করলে অধিক সাওয়াব হবে। যেমন: অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমাদানের সময় সাদাকাহ করলে অধিক পরিমাণে সাওয়াব পাওয়া যায়। এটি ঠিক যেমন স্বল্প বিনিয়োগে অধিক মুনাফা। এই মুনাফা দুনিয়ার নয় বরং আখিরাতে। আবার এমন কোনো খাতে যদি ব্যয় করি যা সাদকায়ে জারিয়াহ, তাহলে এই সাদাকাহর সাওয়াব আমাদের মৃত্যুর পরও আমাদের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"যে ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে দান করে, আল্লাহ তাকে অনেক বেশি দানে পুরস্কৃত করবেন।" আর্থিক ইবাদত, অর্থপ্রদানকারী ব্যক্তির জন্যই লাভ এতে তাঁর গুনাহ মাফ হয় এবং অগনিত সাওয়াব আমলনামায় জমা হয়। মহান রব আমাদেরকে আর্থিক ইবাদতে উৎসাহিত করে বলেন, 'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্য বীজের মতো, যা উৎপন্ন করে সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষেই (উৎপন্ন হয়) একশত করে শস্য এবং আল্লাহ যাকে চান তাঁর সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল ও মহাজ্ঞানী।' (সূরা বাকারা, আয়াত-২৬১)

ইমাম শাফি'ঈ (রহি:) বলেছেন, "আমি চাই মানুষ যেন রামাদানে উদারহস্তে দান খয়রাত করে, এটাই নবীজি (সা:)-এর দেখানো পথ।" দেখা যায় রামাদানে অনেকেই সালাত আর ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর সাদাকার বিষয়টি পাত্তা দেয় না। সালাফরা বলতেন, রাদামান মানেই হলো কুরআন ও দান সাদাকার মাস, আর কিছু না। অর্থাৎ রামাদান মাসে অন্য কিছুর সাওয়াব এগুলোর সমান নয়।

আল্লাহর চোখে দানের পরিমাণ মুখ্য না, বরং দান করছেন কি না সেটাই আসল বিষয়। অনেকে কম পরিমাণ সাদাকা করতে পারে, সেটা সমস্যা না। কারণ, আল্লাহর চোখে এক টাকা দশ লক্ষ টাকার সমান হতে পারে। সুনানে নাসাঈতে বলা আছে, "এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সাওয়াব।"

এক টাকা আপনাকে লক্ষ টাকার চেয়ে দামি সাওয়াব এনে দিতে পারে। কখন? যদি আপনার শুধু দুই টাকা থাকে আর সেখান থেকে এক টাকা দান করেন, তাহলে আপনি আপনার অর্ধেক সম্পদ দান করে দিলেন।

আর যে লোকটা লাখপতি, সে যদি আপনার সমান সাওয়াব পেতে চায়, তাহলে তাকে লক্ষ টাকা দান করতে হবে, কারণ তার সম্পত্তির অর্ধেক করলেও কয়েক লাখ টাকা হয়।

দান করার সময় আপনাকে নশ্র হতে হবে। আপনার এটা ভেবে সম্মানিত বোধ করা উচিত যে, আপনাকে দান করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে। আপনার মুগ্ধ হওয়া উচিত এই ভেবে যে, আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এবং আপনি আল্লাহর জন্যই দিচ্ছেন। আর আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত এই কারণে যে, কেউ একজন তা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সাদাকার মাধ্যমে আপনি আসলে নিজেই নিজের উপকার করছেন।

"আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই।" (সূরাহ বাকারাহ: আয়াত ২৭২)

আপনি যদি গরীব সেই ভিক্ষুককে দান না করেন, আল্লাহ ঠিকই তার জন্য কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা করেই দেবেন। এই ভেবে সম্মানিত বোধ করুন যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন তাকে দান করার সুযোগ দিয়ে। তাই বেশি বেশি দান করুন, যাকে দান করছেন তাকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ এর মাধ্যমে আপনি অন্য কারো না, বরং নিজের উপকার করছেন।

কোনো ভালো আমলকে ছোট করে দেখবেন না। ইবনু উমার (রা:) সাদাকা করার জন্য তাঁর সাথে চিনি রাখতেন। সে যুগের চিনিকে তুলনা করা যেতে পারে আজকের যুগের ক্যান্ডির সাথে। মানুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করত, "আপনি চিনি কেন সাদাকা হিসেবে দান করছেন?" তিনি বলতেন, "কারণ আমি চিনি পছন্দ করি আর আল্লাহ বলেছেন,"তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাসো। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১২)। আরেকবার উমার (রা:) একটা আগুর দান করলেন। মানুষজন বলতে লাগল, "মাত্র একটা আগুর! এটা না তৃষ্ণা মেটায়, না পেট ভরায়।" উমার (রা:) তখন কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন, "অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে।" (সূরাহ যিলযাল: আয়াত ৭)। কিয়ামাতের দিনে আল্লাহ যখন মীযানে আমল পরিমাপ করবেন, তখন আল্লাহ এমন জিনিসও হিসেব করবেন যেটার ওজন শস্য দানার সমান। উমার (রা:) তাদেরকে বললেন, "এই আগুরের ওজন তো শস্য দানা থেকেও বেশি!"

আপনার সাদাকা আপনার সম্পদ, স্বাস্থ্য, ঈমান আর আমলকে বিশুদ্ধ করে। আপনার যদি ৫০০ টাকা থাকে আর তা থেকে ১০০ টাকা দান করে দেন, তাহলে আল্লাহ সাক্ষী আছেন-আপনার সম্পদ কমে যাবে না। অনেকে হয়তো ভাবতে পারে, এটা কীভাবে সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, আল্লাহর কসম, আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এই কথাই বলেছেন যে, দান করলে সম্পদ কমবে না। আর আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি, নিজেদের চাইতেও বেশি বিশ্বাস করি।

মানুষ চায় নিজের টাকাকে চোখের সামনে দেখতে। হোক সেটা নগদ, ব্যাংকের চেক কিংবা ব্যাংক একাউন্টে, আর এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে পারে না, তার এমন সম্পদও থাকতে পারে যা হয়তো সে চোখে দেখে না। যা জমা থাকে আখিরাতের একাউন্টে। দান সাদাকার মাধ্যমে হতে পারে আল্লাহ আপনাকে আসন্ন কোনো রোগ থেকে বাঁচাবেন-হয়তো সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা। হতে পারত আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে, ঔষধ কিনতে হয়েছে, কাজ থেকে ছুটি নিতে হয়েছে, ডাক্তার দেখাতে হয়েছে-যন্ত্রণার কথা বাদই দিলাম। কিন্তু আপনি আন্তরিক নিয়তে একশো টাকা সাদাকা করলেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে সেসব থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন যখন কেউ দান করবে, তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেনই।" তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন।" (সূরাহ সাবা: আয়াত ৩৯)

১৩.যাকাত ও সাদাকাহ: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলামী শরীয়তে আর্থিক ইবাদতের মধ্যে যাকাত এবং সাদাকাহ অন্যতম দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাধারণ অর্থে অনেক সময় দুটিকে একই মনে হলেও, এদের হুকুম, শর্ত এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। যাকাত ইসলামের অন্যতম একটি ফরজ ইবাদত। এটি কেবল একটি দান নয়, বরং ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের একটি নির্দিষ্ট অধিকার। অন্যদিকে সাদাকাহ একটি নফল ইবাদত।

মৌলিক সংজ্ঞা ও হুকুম

১)যাকাত: যাকাত হলো ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। এটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে, সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের ওপর বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সামর্থ্যবানদের জন্য আদায় করা ফরয (বাধ্যতামূলক)।

২)সাদাকাহ: সাদাকাহ শব্দের অর্থ দান। এটি একটি সাধারণ পরিভাষা, যা মূলত নফল বা স্বেচ্ছামূলক দানকে বোঝায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেকোনো ভালো কাজে যেকোনো পরিমাণ অর্থ বা সাহায্য করাই হলো সাদাকাহ।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

কারো ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মূলত ৫টি শর্ত পূরণ হতে হয়:

১)মুসলিম হওয়া: যাকাত কেবল মুসলিমদের ওপর ফরয।

২)প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া: (কিছু মাযহাবে নাবালেগ ও পাগলের মালের ওপরও যাকাত আসে, যা তাদের অভিভাবক আদায় করবেন)।

৩)নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া: প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই পরিমাণ সম্পদ থাকা, যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়।

৪)সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা: নিসাব পরিমাণ সম্পদ চাঁদের হিসাব অনুযায়ী পূর্ণ এক বছর স্থায়ী হতে হবে।

৫)ঋণমুক্ত হওয়া: যে পরিমাণ ঋণ থাকলে মানুষ নিসাব সীমার নিচে নেমে যায়, সে পরিমাণ সম্পদ বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে।

নফল সাদাকাহর ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো পূরণ করা বাধ্যতামূলক না। যেকোনো তার সামর্থ্য অনুযায়ী সাদাকাহ করতে পারে। আবার অর্থ ছাড়াও মানুষ সাদাকাহর সাওয়াব অর্জন করতে পারে। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

►যাকাত কাদের দেওয়া যাবে?

⇒ফকির: যার কিছুই নেই বা অত্যন্ত অভাবী।

⇒মিসকিন: যার সম্পদ আছে কিন্তু প্রয়োজন পূরণ হয় না।

⇒যাকাত কর্মকর্তা: যাকাত আদায় ও বণ্টনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।

⇒দাওয়াতি উদ্দেশ্যে: ইসলামের প্রতি অনুরাগী করার জন্য (নওমুসলিম বা অমুসলিম)।

⇒দাস মুক্তি: ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য (বর্তমানে এটি কার্যকর নয়)।

⇒ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি: যে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম।

⇒আল্লাহর রাস্তায় (ফি সাবিলিল্লাহ): ইসলামের সেবা বা জিহাদে নিয়োজিত ব্যক্তি।

⇒মুসাফির: সফরে গিয়ে অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তি (যিনি নিজ দেশে ধনী হলেও সফরে অসহায়)।

►কাদের যাকাত দেওয়া যাবে না?

নিজের বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী (উর্ধ্বতন বংশধর) এবং ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি (অধস্তন বংশধর)-কে যাকাত দেওয়া যায় না। এছাড়া ধনী ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধরদের জন্য যাকাত নেওয়া জায়েয নয়।

নিচে যাকাত ও সাদাকাহর মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	যাকাত	সাদাকাহ (নফল)
হুকুম ও গুরুত্ব	এটি ইসলামের রুকন এবং ফরয। আদায় না করলে কবিরা গুনাহ হবে।	এটি মুস্তাহাব বা নফল। আদায় করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই।
সম্পদের শর্ত (নিসাব)	সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা সোনার সমপরিমাণ সম্পদ ১ বছর থাকলে ফরয হয়।	সম্পদের কোনো নূন্যতম সীমা বা নিসাব নেই। ১ টাকাও সাদাকাহ করা যায়।
সময়কাল	সম্পদ পূর্ণ ১ বছর মালিকানায় থাকার পর বছরে একবারই দিতে হয়।	বছরের যেকোনো দিন, যেকোনো সময়, যতবার ইচ্ছা দেওয়া যায়।
ব্যয়ের খাত	কুরআনে নির্ধারিত ৮টি সুনির্দিষ্ট খাতেই কেবল দিতে হবে।	খাতের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোনো ভালো বা জনকল্যাণমূলক কাজে দেওয়া যায়।
গ্রহীতার যোগ্যতা	অমুসলিম, ধনী ব্যক্তি বা নিজের আপন উর্ধ্ব/অধস্তন বংশধরদের দেওয়া যায় না।	ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম বা আত্মীয়-স্বজন যে কাউকেই দেওয়া যায়।
অদায়ের মাধ্যম	এটি কেবল আর্থিক সম্পদের মাধ্যমেই আদায় করতে হয়।	অর্থ ছাড়াও শ্রম, ভালো ব্যবহার, এমনকি একটা মুচকি হাসিও সাদাকাহ হতে পারে।

১৪. নফস বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধিতে সাদাকাহর প্রভাব

নফস বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি (যাকে ইসলামি পরিভাষায় 'তায়কিয়াতুন নাফস' বলা হয়) হলো একজন মুমিনের জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মানুষের নফস স্বভাবগতভাবেই তিনটি স্তরে আবর্তিত হয়: নফসে আন্নারা (মন্দ কাজের নির্দেশ দাতা), নফসে লাউওয়ামা (অনুতপ্ত মন) এবং নফসে মুতমায়িনাহ (প্রশান্ত আত্মা)। নফসকে 'আন্নারা' বা পক্ষিলতার স্তর থেকে 'মুতমায়িনাহ' বা প্রশান্তির স্তরে উন্নীত করার জন্য সাদাকাহ একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক থেরাপি হিসেবে কাজ করে। নিচে এর প্রভাবগুলো আরও গভীর ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. নফসের দাসত্ব ও বস্তুবাদের শৃঙ্খল মুক্তি:

মানুষের নফসের একটি বড় দুর্বলতা হলো সে দৃশ্যমান বস্তু ও সম্পদের দাস হয়ে পড়তে ভালোবাসে। ধন-সম্পদের প্রতি এই অন্ধ মোহ মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষ যখন তার কষ্টার্জিত ও প্রিয় সম্পদ অন্যকে দিয়ে দেয়, তখন সে মূলত নিজের নফসকে একটি বার্তা দেয়—“তুমি সম্পদের মালিক নও, বরং সম্পদ তোমার অধীনস্থ।” এটি নফসের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বস্তুবাদের শৃঙ্খল থেকে আত্মাকে মুক্ত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে ব্যয় করবে।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৯২)

২. শয়তানি কুমন্ত্রণা (ওসওয়াসা) ও কৃপণতার প্রাচীর ভাঙা:

মানুষ যখনই দান করার ইচ্ছা পোষণ করে, নফস ও শয়তান মিলে তাকে ভবিষ্যতের অভাব, দারিদ্র্য এবং সংকটের ভয় দেখাতে শুরু করে। এটি নফসের একটি নেতিবাচক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ: সাদাকাহ করার অর্থ হলো নফসের এই নেতিবাচক ভয়কে বুড়ো আঙুল দেখানো। নিয়মিত দানের মাধ্যমে মানুষ শয়তানের এই ওসওয়াসাকে পরাস্ত করার মানসিক শক্তি অর্জন করে।

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৮)

৩. 'রিয়া' (লোকদেখানো মানসিকতা) ও নিফাক দূরীকরণ:

নফস সবসময় প্রশংসা পেতে পছন্দ করে। সে চায় সমাজ তাকে 'দাতা' বা 'মহৎ' বলুক। এটি আত্মশুদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, যাকে ইসলামে 'ছোট শিরক' বা রিয়া বলা হয়েছে।

গোপন সাদাকাহর ভূমিকা: মানুষ যখন গভীর রাতে বা এমনভাবে দান করে যে ডান হাত কী দিল বাম হাতও জানতে পারল না, তখন নফস কোনো প্রশংসার খোরাক পায় না। এই চর্চা নফসকে পুরোপুরি অবদমিত করে এবং অন্তরে 'ইখলাস' বা খাঁটি নিয়ত তৈরি করে। হাদিস অনুযায়ী, কিয়ামতের দিন যে সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবেন, তাদের একজন হলেন গোপন দানকারী।

৪. অন্তরের কঠোরতা দূরীকরণ ও নশ্বতা অর্জন:

পাপ এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে মানুষের নফস বা অন্তর কখনো কখনো পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখেও তখন মন গলে না।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে তার অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, "তুমি যদি তোমার মনকে নরম করতে চাও, তবে এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে খাবার খাওয়াও।" (মুসনাদে আহমাদ)। সাদাকাহর মাধ্যমে সরাসরি মানুষের উপকার করলে নফসের ভেতরের নির্ধূরতা দূর হয় এবং সেখানে দয়া ও নশ্বতার উদয় হয়।

৫. গুনাহের কালিমা মোচন ও আত্মিক প্রশান্তি:

মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। প্রবৃত্তি তখন সেই গুনাহের দিকে বারবার প্ররোচিত করে। সাদাকাহ এই কালিমা ধুয়ে ফেলার সাবান হিসেবে কাজ করে।

হাদিসের প্রমাণ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে দেয়, সাদাকাহ তেমনি মানুষের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।" (জামে আত-তিরমিজি)। গুনাহ মাফ হওয়ার পর নফস এক অদ্ভুত আত্মিক শান্তি ও পবিত্রতা অনুভব করে, যা তাকে পরবর্তী সময়ে ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে।

৬. 'শুকরগোয়ারি' বা কৃতজ্ঞতাবোধের উন্মেষ:

নফসের আরেকটি রোগ হলো সে যা পায় না, তা নিয়ে আক্ষেপ করে; কিন্তু যা পেয়েছে তার কদর করে না।

বাস্তব প্রভাব: একজন মানুষ যখন সাদাকাহ দিতে গিয়ে নিজের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা বা শারীরিক কষ্টে থাকা মানুষের অবস্থা সশরীরে দেখে, তখন তার নফস লজ্জিত হয়। সে বুঝতে পারে আল্লাহ তাকে কত নেয়ামতে রেখেছেন। এই অনুভূতি নফসকে লোভী বা অসন্তুষ্ট হতে দেয় না, বরং তাকে পরম 'শুকরগোয়ার' (কৃতজ্ঞ) বান্দায় পরিণত করে।

নফসের পরিশুদ্ধিতে সাদাকাহর ভূমিকা অনেকটা শল্যচিকিৎসার (Surgery) মতো। এটি মন থেকে লোভ, কৃপণতা, অহংকার, রিয়া এবং দুনিয়াপূজা—এই পাঁচটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধিকে কেটে বের করে দেয়। এর বিপরীতে অন্তরে তাওয়াক্কুল (ভরসা), ইখলাস (নিষ্ঠা), দয়া, নশ্বতা ও সন্তুষ্টি প্রতিস্থাপন করে।

এ কারণেই ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও সাদাকাহ একে অপরের পরিপূরক।

১৫. অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাদাকাহর ভূমিকা

অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাদাকাহর ভূমিকা কেবল কিছু টাকা দান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সুসংহত সামষ্টিক অর্থনৈতিক (Macroeconomic) ব্যবস্থার ভিত্তি। নিচে এই বিষয়টি আরও গভীর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, আল-কুরআনের আইন এবং বাস্তবমুখী প্রভাবের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. সম্পদ কুক্ষিগতকরণের মনস্তত্ত্ব ও তার প্রতিকার:

পুঁজিবাদী বা সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের প্রবণতা থাকে সম্পদ জমিয়ে রাখা (Hoarding of wealth)। এর ফলে বাজারে অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়, যাকে অর্থনীতিতে 'তারল্য সংকট' বা Liquidity Crisis বলা হয়। ইসলাম একদিকে সম্পদ জমিয়ে রাখাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে, অন্যদিকে সাদাকাহর মাধ্যমে তা বাজারে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪)। সাদাকাহ এই পুঞ্জীভূত সম্পদকে ভেঙে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করে।

২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর 'ক্রয়ক্ষমতা' (Purchasing Power) বৃদ্ধি:

অর্থনীতির একটি সাধারণ নিয়ম হলো, দরিদ্র মানুষের খরচের প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume - MPC) ধনীদের চেয়ে অনেক বেশি। ধনীদের হাতে অতিরিক্ত টাকা থাকলে তারা তা বিলাসবহুল সামগ্রী কিনতে বা ব্যাংকে জমিয়ে রাখতে পছন্দ করে। কিন্তু সাদাকাহর টাকা যখন একজন দরিদ্র মানুষের হাতে যায়, সে তা দিয়ে চাল, ডাল, তেল বা কাপড়ের মতো মৌলিক জিনিস কেনে। এর ফলে স্থানীয় বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা (Demand) বাড়ে। চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়ে, আর উৎপাদন বাড়লে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের (Employment) সৃষ্টি হয়। এভাবে সাদাকাহ পুরো দেশের জিডিপি (GDP) বৃদ্ধিতে পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

৩. বেকারত্ব দূরীকরণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি:

সাদাকাহর একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপ হলো অনুদান বা পুঁজি হিসেবে দেওয়া। অনেক সময় যোগ্য ও অভাবী ব্যক্তিকে সাদাকাহর অর্থ দিয়ে একটি রিকশা কিনে দেওয়া হয়, সেলাই মেশিন দেওয়া হয়, অথবা ছোট ব্যবসা শুরু করার মূলধন দেওয়া হয়। এর ফলে যে ব্যক্তিটি গতকাল পর্যন্ত সমাজের ওপর 'বোঝা' বা কেবল 'ভোক্তা' (Consumer) ছিল, সে আজ একজন 'উৎপাদক' (Producer) বা করদাতায় পরিণত হয়। সাদাকাহ এভাবে স্থায়ীভাবে বেকারত্ব দূর করে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আনে।

৪. কল্যাণমুখী ঋণ ব্যবস্থা (করজে হাসানা) শক্তিশালীকরণ:

সাদাকাহর একটি বড় অংশ 'করজে হাসানা' বা করমুক্ত ঋণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গেলে চড়া সুদের কবলে পড়ে, যা তাদের আরও দেউলিয়া করে দেয়। সাদাকাহভিত্তিক ফান্ড থেকে যখন বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হয়, তখন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, যা অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রধান চাবিকাঠি।

৫. রাষ্ট্রীয় কর বা ট্যাক্স ব্যবস্থার পরিপূরক:

একটি দেশের সরকার কর (Tax) আদায় করে রাস্তাঘাট, হাসপাতাল বা উন্নয়নমূলক কাজ করে। কিন্তু অনেক সময়ই কর ফাঁকি দেওয়া বা দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রের কোষাগার শূন্য থাকে।

সাদাকাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য: সাদাকাহ কোনো জোরপূর্বক নেওয়া ট্যাক্স নয়, এটি মানুষ মন থেকে আল্লাহর ভয়ে দেয়। ফলে এখানে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকে না। সাদাকাহর মাধ্যমে নির্মিত রাস্তা, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, শিক্ষা বৃত্তি ইত্যাদি সরকারের ওপর থেকে অর্থনৈতিক চাপ কমিয়ে দেয় এবং সামাজিক বাজেট সুষম রাখতে সাহায্য করে।

৬. সামাজিক অপরাধের অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস:

অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা যখন চরম রূপ নেয়, তখন সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও মাদক ব্যবসা বেড়ে যায়। এগুলো দমনের জন্য রাষ্ট্রকে পুলিশ, আদালত ও কারাগারের পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা অনুৎপাদনশীল খাত। সাদাকাহর মাধ্যমে দরিদ্রদের পুনর্বাসন করলে অপরাধের হার কমে আসে, ফলে রাষ্ট্রের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বেঁচে যায় এবং তা উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

একটি চমৎকার হাদিসের দৃষ্টান্ত:

রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন:

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দুনিয়াবী সংকট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সংকট দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অভাবী মানুষের সহজ করে দেবে (সাহায্য করবে), আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার পথ সহজ করে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম)

অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাদাকাহ হলো সমাজের "স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক" (Automatic Stabilizer)। এটি ধনীদের উদ্ধৃত্ত অংশকে বৈপ্লবিক উপায়ে দরিদ্রদের পুঁজিতে রূপান্তর করে, যার ফলে সমাজ থেকে পরনির্ভরশীলতা দূর হয় এবং একটি আত্মনির্ভরশীল ও সুষম অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে।।

১৬. সামাজিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে রমাদানের সাদাকাহ

রমাদানে সাদাকাহর বিশেষ গুরুত্বের মূলে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দর্শন। ইসলামী শরীয়তে দান-সাদকাহ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত করে এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। এই মাসে সাধারণ সাদাকাহর পাশাপাশি সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) এবং যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। ইসলামে রমাদানের সাদাকাহ কেবল একটি ব্যক্তিগত সওয়াবের মাধ্যম নয়, বরং এটি সমাজকে এক সুতোয় বাঁধার এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার একটি শক্তিশালী সামাজিক হাতিয়ার।

সামাজিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে রমাদানের সাদাকাহর প্রভাব নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব দূরীকরণ:

সাধারণ সময়ে সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি বিশাল দূরত্ব থাকে, যা অনেক সময় অবজ্ঞা বা ক্ষোভের জন্ম দেয়। কিন্তু রমাদান মাসে ধনী-দরিদ্র সবাই একসঙ্গে রোজা রাখে এবং একই ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে। এই ক্ষুধার অনুভূতি ধনীদের মনে দরিদ্রদের প্রতি সত্যিকারের দরদ ও সহমর্মিতা জাগিয়ে তোলে। যখন একজন ধনী ব্যক্তি রমাদানে সাদাকাহ নিয়ে কোনো দরিদ্র মানুষের দুয়ারে দাঁড়ায়, তখন তাদের মধ্যকার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দেয়াল ভেঙে যায়। এটি উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে।

২. ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দকে সর্বজনীন করা (সাদাকাতুল ফিতর):

ইসলামী সমাজব্যবস্থার সৌন্দর্য হলো, এখানে কেউ একা একা উৎসব উদযাপন করতে পারে না। রমাদানের শেষে যে ঈদ আসে, সেই ঈদের আনন্দ যেন সমাজের প্রতিটি ঘরে পৌঁছায়, সেজন্য ইসলাম 'সাদাকাতুল ফিতর' বা ফিতরা ওয়াজিব করেছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) ফিতরা ফরয করেছেন যেন এর মাধ্যমে মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা হয় এবং ঈদের দিন তাদের যেন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হাত পাততে না হয় (আবু দাউদ)। ঈদের নামাজের আগেই এই সাদাকাহ গরিবদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার নিয়ম। এর ফলে সমাজের খেটে খাওয়া, দিনমজুর মানুষগুলোও তাদের পরিবার নিয়ে নতুন পোশাক ও ভালো খাবারের মাধ্যমে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে, যা সামাজিক সংহতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

৩. ইফতার করানোর মাধ্যমে সামাজিক মেলবন্ধন:

রমাদান মাসের একটি অন্যতম সেরা সাদাকাহ হলো অন্যকে ইফতার করানো। এটি সামাজিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির এক অভূতপূর্ব মাধ্যম।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো রোজা পালনকারীকে ইফতার कराবে, সে ওই রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে..." (জামে আত-তিরমিজি)।

এই সওয়াবের আশায় পাড়া-মহল্লায়, মসজিদে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে বসে ইফতার করে।

আবার অনেকে দরিদ্র পরিবারগুলোর ঘরে ঘরে ইফতার সামগ্রী পৌঁছে দেয়। এই যৌথ ইফতার কালচার মানুষের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দেয় এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এক চমৎকার সামাজিক সম্প্রীতি ও মেলবন্ধন তৈরি করে।

৪. হিংসা, বিদ্বেষ ও সামাজিক অপরাধের অবসান:

অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে অনেক সময় দরিদ্রদের মনে ধনীদের প্রতি হিংসা বা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে চুরি, ছিনতাই বা সামাজিক বিশৃঙ্খলার রূপ নেয়।

শান্তিময় সমাজ গঠন: রমাদানে যখন ব্যাপক হারে সাদাকাহ, যাকাত ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়, তখন দরিদ্র মানুষগুলো বুঝতে পারে যে ধনীরা তাদের শত্রু নয়, বরং বিপদের বন্ধু। এই উপলব্ধি গরিবদের মন থেকে ধনীদের প্রতি হিংসা ও ক্ষোভ দূর করে দেয়। ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা কমে আসে এবং একটি শান্তিময়, নিরাপদ ও সংহতিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে ওঠে।

৫. অভাবী ও ঋণগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও আত্মমর্যাদা রক্ষা:

রমাদানের সাদাকাহ এবং যাকাতের ফান্ডের মাধ্যমে সমাজের অনেক অসহায়, বেকার বা ঋণগ্রস্ত মানুষকে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়। যখন সমাজ বা মহল্লার বিভাগালীরা সম্মিলিতভাবে কোনো সংকটাপন্ন ভাইয়ের পাশে দাঁড়ায়, তখন সে একাকীত্ব বা অসহায়ত্ব বোধ করে না। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের এই বাস্তব রূপ দেখে মানুষের মধ্যে সমাজ ও দেশের প্রতি মমত্ববোধ বাড়ে। এটি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা দূর করে প্রতিটি নাগরিকের আত্মমর্যাদা রক্ষা করে।

আল-কুরআনের বলা আছে, "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন করো..." (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০)

রমাদানের সাদাকাহ হলো একটি সমাজকে সুসংহত করার বার্ষিক মহোৎসব। এটি সমাজের উঁচু শ্রেণীকে বিনয়ী হতে শেখায় এবং নিচু শ্রেণীকে সম্মানিত করে। ফিতরা, যাকাত এবং সাধারণ দানের মাধ্যমে রমাদান মাস পুরো সমাজকে একটি একক পরিবারে রূপান্তর করে, যেখানে একজনের সুখে অন্যজন আনন্দিত হয় এবং একজনের কষ্টে অন্যজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

১৭. রমাদানে সাদাকাহর অর্থ ব্যয়ের কিছু টিপস

পবিত্র রমজান মাস হলো দান-সদকা, সহমর্মিতা ও উদারতার শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাসে সাদাকাহ করার ফজিলত অনেক বেশি, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ মাসে অত্যধিক দানশীল হতেন। ইসলামিক হাদিসের আলোকে রমাদানে সাদাকাহ করার জন্য কিছু সুন্দর ও বাস্তবসম্মত টিপস নিচে দেওয়া হলো:

১. প্রতিদিন ছোট ছোট সাদকা করার অভ্যাস গড়ুন:

প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু টাকা দান করুন অথবা আলাদা করে একটি মাটির ব্যাংকে জমা করুন। শেষ রমাদানে পুরো টাকা দান করুন। রাসূল ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদকাহ ওয়াজিব।” সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি কারো কাছে কিছু না থাকে?” তিনি বললেন, “তাহলে সে নিজের হাতে কাজ করে উপার্জন করবে এবং নিজেকে ও অন্যকে উপকার করবে।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) রমজানে প্রতিদিন ইফতার করানো, পানি বিতরণ, হাসি মুখে কথা বলা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো—এসবও সাদকাহ। এগুলো দিয়ে শুরু করুন।

২. রোজাদারকে ইফতার করানোকে অগ্রাধিকার দিন:

রাসূল ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে তার (রোজাদারের) অনুরূপ সওয়াব পাবে, রোজাদারের সওয়াব থেকে কমানো হবে না।” (তিরমিজি, হাদিস: ৮০৭)। এটি রমাদানের সবচেয়ে সুন্দর সাদকাহ। সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিদিন ১-২ জনকে বা পরিবারকে ইফতার করানোর চেষ্টা করুন।

৩. রমাদানে সাদাকা বাড়িয়ে দিন, নবীজির সুন্নাহ অনুসরণ করুন:

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: “রাসূল ﷺ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। রমজানে জিবরীল আ. যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন শিক্ষা দিতেন, তখন তিনি প্রবল বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন।” (সহীহ বুখারী ১৯০২, মুসলিম ২৩০৮)। এ মাসে দানের হাত আরও প্রসারিত করুন। অন্য মাসের তুলনায় বেশি দান করুন।

৪. রমাদানের সাদকাহকে সর্বোত্তম সাদকাহ মনে করুন:

আনাস রা. থেকে বর্ণিত: রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, “কোন সাদাকাহ সর্বোত্তম?” তিনি বললেন, “রমাদানের সাদকাহ।” (তিরমিজি, হাদিস: ৬৬৩)। এ হাদিস অনুসারে রমজানে যেকোনো সাদকা অন্য সময়ের চেয়ে উত্তম। তাই এ মাসে যত বেশি সম্ভব দান করুন।

৫. সাদকায়ে জারিয়া (চলমান সদকা) এর দিকে মনোযোগ দিন:

রাসূল ﷺ বলেছেন: “মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তানের দোয়া।” (সহীহ মুসলিম ১৬৩১) রমাদানে মসজিদে দান, কূপ খনন, গাছ রোপণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য স্থায়ী তহবিল—এগুলো সাদকায়ে জারিয়া। রমাদানে এমন কিছু দান করুন যা মৃত্যুর পরও সওয়াব দিতে থাকবে।

৬. গোপনে সাদকাহ দিন, যতটা সম্ভব:

রাসূল ﷺ বলেছেন: “গোপনে দেওয়া সদকা আল্লাহর রাগ নিবারণ করে।” (তিরমিজি)। রমজানে অনেকে প্রকাশ্যে দান করে। কিন্তু গোপনে দান করলে সওয়াব আরও বেশি। গরিব আত্মীয়-প্রতিবেশীকে চুপচাপ সাহায্য করুন।

৭. স্বজন ও প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার দিন:

নিজের আত্মীয়-স্বজন বা আশেপাশের দরিদ্র প্রতিবেশীদের খোঁজ নিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন ইফতার বা সাহারির ব্যবস্থা করতে পারেন।

৮. মসজিদ ও মাদ্রাসায় সহায়তা: স্থানীয় মসজিদ বা হিফজুল কুরআন মাদ্রাসায় কুরআন শরীফ, জায়নামাজ বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দান করতে পারেন।

৯. শেষ ১০ রাতের দান: কদরের রাত পাওয়ার নিয়ত করুন। শেষ ১০ রাত নিয়মিত দান করুন। প্রতিদিন ১ টাকা হলেও দান করুন।

১০. মাসিক সাদাকাহ ক্যালেভার: সাদাকাহ করার জন্য একটি রুটিন তৈরি করতে পারেন, যেমন: বিশেষ করে বিজোড় রাতগুলোতে দান করা বা জুমাবারগুলোতে নিয়মিত দান করা।

১১. পরিবারের জন্য খরচ: পরিবারের ভালো খাবারের ব্যবস্থা করুন। বাবা-মাকে বিশেষ উপহার দিন। এটিও সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়।

১২. মসজিদের পানির বিল পরিশোধ করুন। ওয়ুখানা মেরামতের খরচ বহন করুন।

১৩. পোশাক বিতরণ: গৃহকর্মীকে নতুন জামা উপহার দিন। এতিমখানায় শিশুদের জামা কাপড় দিন।

১৪. শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানো: রিকশাচালককে অতিরিক্ত ভাড়া দিন। দিনমজুরদের কাজের চাপ কমিয়ে দিন। ডেলিভারি ম্যানকে বকশিস বা ইফতার দিন।

১৫. মেধা ও সময়ের দান: অসুস্থ প্রতিবেশীর ওষুধ কিনে দিন। অভাবী শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পড়ান। মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন।

১৬. যাকাত ও ফিতরা সময়মতো আদায় করুন:

রমজানে যাকাত আদায় করা উত্তম। শেষে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) আদায় করুন, যাতে রোজা কবুল হয় এবং গরিবরা ঈদের আনন্দে শরিক হতে পারে।

১৭. যথাসম্ভব আশেপাশের মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিন।

১৮. দাওয়াহ'র নিয়তে সাদাকাহ করুন: ইসলামিক বই ও লিফলেট বিতরণ করুন। দ্বীনি অ্যাপ তৈরিতে অর্থ সাহায্য করুন।

১৯. উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নেই এমন পরিবারের হাল ধরুন।

২০. তীব্র গরমে পাখি ও প্রাণীকে পানি দিন।

এছাড়াও নানা উপায়ে দান-সাদাকাহ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, রমাদানে দান করা সম্পদ কমায় না, বরং রিজিকে বরকত আনে, গুনাহ মাফ করে এবং জান্নাতের পথ সহজ করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে রমাদানের ফজিলত কাজে লাগানোর এবং নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

১৮. সাদাকাহর মুহাসাবা

আনপ্রোডাক্টিভিটির চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে একটি বিশেষ আমলের কথা বলতে চাই। আমলটি খুব কঠিন না, খুব বেশি সময়ও লাগে না। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো, খুব কম মানুষই এটা নিয়মিত করে। আমলটির নাম হলো মুহাসাবা, অর্থাৎ আত্মপর্যালোচনা। মুহাসাবা কী এবং কেন এটা জরুরি? মুহাসাবা মানে হলো নিজের হিসাব নিজে নেওয়া। প্রতিদিনের শেষে একটু থেমে ভাবা, আজকের দিনটা কেমন গেল? কী করলাম, কী করতে পারলাম না, কোথায় ভুল হলো। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, যে নিজের হিসাব নেয় না, সে নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু।

রামাদান হলো সেই মাস যেখানে আমাদের প্রতিটি দিন মূল্যবান। একটি দিনও যদি অলসতায় বা গাফিলতিতে চলে যায়, সেটা ফিরে পাওয়ার সুযোগ নেই। তাই প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিনিট নিজের সাথে বসুন। দিনের পুরো হিসাবটা একবার মনে করুন।

প্রতিদিন নিজেকে যে প্রশ্নগুলো করবেন-

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আজকের দিনটা কি আসলেই প্রোডাক্টিভ ছিল? যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কী কী ভালো কাজ করতে পেরেছি আজকে? কোন জিনিসটা আমাকে আজকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে ভালো থাকতে? আর এই ভালো দিনটার মতো বাকি দিনগুলোকেও কীভাবে কাজে লাগাতে পারি? আর যদি দিনটা ভালো না যায়, তাহলে ভাবুন কোথায় সময় নষ্ট হলো? কোন মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারিনি? আগামীকাল কীভাবে সেটা ঠিক করব? এই প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়ে দিন শেষ করুন। আল্লাহর কাছে শোকর করুন যদি দিনটা ভালো গিয়ে থাকে। আর যদি ভালো না যায়, তাহলে তওবা করুন এবং পরের দিনের জন্য নতুন নিয়ত বেঁধে নিন। প্রতিদিন নিয়ত দৃঢ় করুন। রামাদানের প্রতিটি সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু সময় নিন। মনে মনে ঠিক করুন আজকের দিনটা কেমন কাটাতে চান। কতটুকু সাদাকাহ করবেন, কতটা সময় কারোর জন্য দোয়ায় দেবেন, কাকে সাহায্য করবেন। নিয়তটা পরিষ্কার থাকলে দিনটা এমনিতেই অনেক গোছানো হয়। প্রত্যেক বছর রামাদানকে বিশেষ করুন একটি অনন্য আমল দিয়ে

নিজেকে একটা প্রশ্ন করুন। এমন কোনো সাদাকাহ আছে কি যেটা এই রামাদানে করতে পারলে বছর শেষে আর কোনো আফসোস থাকবে না? এমন কিছু যা আগে কখনো করেননি, যা করতে হলে নিজের কমফোর্ট জোনের একটু বাইরে যেতে হবে? হয়তো সেটা হতে পারে জীবনের সবচেয়ে বড় দান, যা এই রামাদানে করতে পারেন। মানিব্যাগ খুলুন, কোনো একটি মানবকল্যাণমূলক কাজে বা দাতব্য প্রকল্পে এমন একটি দান করুন যেটা করার পর আপনার বুকটা হালকা লাগবে। রামাদানে দানের নেকি অন্য সময়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি, এই সুযোগটা কাজে লাগান। হয়তো সেটা হতে পারে এমন কারো সাথে সম্পর্ক ঠিক করা যার সাথে অনেকদিন ধরে কথা নেই। বা এমন কাউকে ইফতারে ডাকা যে একা থাকে।

সাদাকাহর হিসাব রাখুন। রামাদানের প্রতিদিন নিজের সাদাকাহর হিসাব নিন। আজকে কাউকে সাহায্য করতে পেরেছি কি? কাউকে একটু ভালো কথা বলেছি? কারো জন্য দোয়া করেছি? কারোর ঋণ মাফ করে দিয়েছি? ছোট ছোট এই কাজগুলোই আসলে আমাদের রামাদানকে ভেতর থেকে সমৃদ্ধ করে।

১৯. আধুনিক যুগে সাদাকাহ প্রদানের কৌশল ও মাধ্যম

আধুনিক যুগে ডিজিটাইজেশন, বিশ্বায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার কল্যাণে সাদাকাহ (দান) প্রদানের কৌশল ও মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন অত্যন্ত দ্রুত, স্বচ্ছ এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অভাবী মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আধুনিক প্রযুক্তির মিশ্রণে সাদাকাহ বা দান-সদকা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। অতীতে যেখানে মসজিদে বা হাটে-বাজারে থালা হাতে সাহায্য চাওয়া কিংবা রমাদানে সরাসরি কাপড় বা চাল বিতরণের ঐতিহ্য ছিল প্রধান, বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশে সেই সনাতন ধারণার পাশাপাশি দ্রুতগতিসম্পন্ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসই মডেল তৈরি হয়েছে।

ডিজিটাল ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS)

বাংলাদেশে ক্যাশলেস ডোনেশন বা নগদ টাকা ছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে দানের সংস্কৃতি তৈরিতে মোবাইল ব্যাংকিং বিপ্লব ঘটিয়েছে।

►বিকাশ, নগদ ও রকেটের ডোনেশন প্ল্যাটফর্ম: বিকাশ অ্যাপের ভেতরের 'Donation' উইন্ডোটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল ক্যাশ সংগ্রহের মাধ্যম। বর্তমানে বিকাশ অ্যাপের মাধ্যমে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রায় ৫০টিরও বেশি চ্যারিটি ফান্ডে সরাসরি অনুদান দেওয়া যায়। তাছাড়া, ইউএসএসডি কোড (*২৪৭# বা *১৬৭#) ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্টফোন ছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এখন যেকোনো সময় ওয়ান-ক্লিক ডোনেশন বা সেল্ড মানি করতে পারছেন।

►মাইক্রো-ডোনেশন বা ক্ষুদ্র দান: ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে বাংলাদেশে এখন সর্বনিম্ন '১ টাকা' থেকে শুরু করে যেকোনো অঙ্কের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে দান করা সম্ভব। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের মতো বড় চ্যারিটিগুলো তাদের ওয়েবসাইটে মাত্র ১০ টাকা দিয়েও নিয়মিত ডিস্ট্রিবিউটেড দানের অভ্যাস গড়ার ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও দীর্ঘমেয়াদী সাদাকাহ মডেল

বাংলাদেশের মানুষ এখন আবেগতাড়িত সাময়িক দানের চেয়ে এমন প্রতিষ্ঠানে দান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন যারা পেশাদারিত্বের সাথে টাকার দীর্ঘমেয়াদী ও দৃশ্যমান প্রভাব নিশ্চিত করে।

►আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন: শায়খ আহমাদুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি বাংলাদেশে আধুনিক শরিয়াহ-ভিত্তিক স্বচ্ছ সাদাকাহ ব্যবস্থাপনার একটি রোল মডেল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোতে এই প্রতিষ্ঠানটি কোটি কোটি টাকার ডিজিটাল ডোনেশন সংগ্রহ করে নিখুঁতভাবে মাঠপর্যায়ে বিতরণ করেছে। কেবল জরুরি ত্রাণই নয়, সদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে পরিবেশ সুরক্ষায় তারা গত ৫ বছরে ৫ লাখেরও বেশি (২০২১-২০২৫ সালের মধ্যে ৫,৫৩,৭০৪টি) বৃক্ষ রোপণ ও ফলের বাগান তৈরি করেছে, যা সম্পূর্ণ ডোনারদের অর্থায়নে পরিচালিত। ২০২৩ সালের গেজেট অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এই প্রতিষ্ঠানটিকে কর অব্যাহতি সুবিধা দেওয়ায় কর্পোরেট ও উচ্চবিত্তদের সাদাকাহ দেওয়ার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

►সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (CZM): বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে যাকাত এবং সাদাকাহর অর্থকে একত্রিত করে দরিদ্র পরিবারগুলোকে স্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী করার কাজে নিয়োজিত একটি অন্যতম

তথ্যশীর্ষ প্রতিষ্ঠান।

- মাস্তুল ফাউন্ডেশন: মাস্তুলের এতিমখানা ও দাফন সেবা প্রজেক্টগুলো মূলত ফেসবুক, ইউটিউব এবং বিকাশ-নগদ ডোনেশনের ওপর ভিত্তি করে সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সাদাকাহর সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে।
- ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা : এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সময় যাকাত, নওমুসলিম ফান্ড, কুরবানি ইত্যাদি ফান্ডে সাদাকাহ সংগ্রহ করে থাকে। একই সাথে এর তথ্যাদি গুগল শীটের মাধ্যমে শেয়ার করে, সচ্ছতার প্রমাণ দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আধুনিক সাদাকাহর অভিনব কৌশল

বাঙালি মুসলিম সমাজে এখন বেশ কিছু সৃজনশীল উপায়ে অনার্থিক ও টেকসই সাদাকাহর চর্চা দেখা যাচ্ছে:

- স্মার্ট ইফতার ও কুরবানির প্রজেক্ট: রমজান মাসে রাস্তায় জটলা পাকিয়ে ইফতার বিতরণের পরিবর্তে আধুনিক সংস্থাগুলো আগে থেকে কুপন বা টোকেন বিতরণ করে সুশৃঙ্খলভাবে হাজার হাজার টন খাদ্যসামগ্রী প্যাক করে দরিদ্রদের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে।
- উদ্বৃত্ত খাবার ও ফুড এটিএম: ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে কিছু তরুণ উদ্যোক্তা ও সামাজিক সংস্থা রাস্তার পাশে বা হাসপাতালের সামনে 'মানবতার দেয়াল' বা 'শেয়ারিং ফ্রিজ' স্থাপন করেছেন। বিয়েবাড়ি বা রেস্টোরাঁর উদ্বৃত্ত ভালো খাবার নষ্ট না করে সেখানে রেখে আসা হয়, যা ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য একটি চমৎকার আধুনিক সাদাকাহ।
- অনলাইন ব্লাড ব্যাংক ও ফ্রিল্যান্সিং জ্ঞান বিতরণ: ফেসবুক ভিত্তিক বিভিন্ন ব্লাড ডোনেশন গ্রুপে বিনামূল্যে রক্ত দেওয়াকে তরুণ প্রজন্ম জীবন বাঁচানোর একটি বড় সাদাকাহ মনে করে। এছাড়া আইটি ফ্রিল্যান্সার বা শিক্ষকেরা ইউটিউব বা ফেসবুক পেজ খুলে ফ্রিতে স্কিল শেখাচ্ছেন, যা আধুনিক 'সাদাকাহ জারিয়া' (প্রবহমান জ্ঞান)-এর চমৎকার উদাহরণ।

বাংলাদেশে আধুনিক মাধ্যমে সাদাকাহর সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ

সুবিধা	চ্যালেঞ্জ
স্বচ্ছতা ও অডিট রিপোর্ট: আস-সুন্নাহর মতো সংস্থাগুলো প্রতি বছর তাদের অডিট ও প্রজেক্ট রিপোর্ট প্রকাশ করায় সাধারণ মানুষ টাকার সঠিক ব্যবহার দেখতে পায়।	ভুয়া ফান্ডারাইজিং পেজ: ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ বা পেজ খুলে চিকিৎসার নামে ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার ঘটনা বাড়ছে।
প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংযোগ: রেমিট্যান্স চ্যানেলের মাধ্যমে কার্ড বা আন্তর্জাতিক অ্যাপ (যেমন: LaunchGood) ব্যবহার করে প্রবাসীরা সরাসরি দেশের এতিমখানা বা দুর্যোগে টাকা পাঠাতে পারছেন।	ডিজিটাল ডিভাইড: দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক মানুষ এখনও অ্যাপ প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত না হওয়ায় আধুনিক চ্যারিটিগুলোর আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে আধুনিক যুগে সাদাকাহর মূল দর্শন হলো—"ব্যক্তির ক্ষুদ্র অনুদান, প্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ কল্যাণ।" প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং ভুয়া ট্রাস্ট বা প্রতারকদের হাত থেকে সচেতন থেকে নির্ভরযোগ্য ডোমেইনে সাদাকাহ প্রদান করলে তা দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচনে অবিশ্বাস্য ভূমিকা রাখতে পারে।

২০. সাদাকাহ ও ডিজিটাল মাধ্যম: সম্ভাবনা ও সচেতনতা

একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের (Social Media) বহুল ব্যবহার মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। এর ব্যতিক্রম ঘটেনি ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ 'সাদাকাহ' বা স্বেচ্ছামূলক দানের ক্ষেত্রেও। ডিজিটাল মাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়া দান-সাদাকাহর পদ্ধতিকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। এটি এখন কেবল একটি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের মাধ্যম নয়, বরং বিশ্বব্যাপী তাৎক্ষণিক সামাজিক সংকট মোচনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়া ভিত্তিক সাদাকাহর সুবিধাসমূহ :

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন- Facebook, X, YouTube) এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেমের মেলবন্ধন সাদাকাহর পরিধিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর প্রধান সুবিধাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. গণ-অর্থায়ন বা ক্রাউডফান্ডিং-এর মাধ্যমে দ্রুত তহবিল সংগ্রহ (Rapid Crowdfunding):

সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর 'নেটওয়ার্ক ইফেক্ট' (Network Effect)। কোনো জটিল রোগীর জরুরি চিকিৎসা বা আকস্মিক দুর্ঘটনার (যেমন- বন্যা বা অগ্নিকাণ্ড) সময় যখন বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন একটি পোস্ট বা ভিডিও নিমেষেই লাখে মানুষের নিউজফিডে পৌঁছে যায়। ফলে অল্প সময়ে বিশাল অঙ্কের তহবিল গঠন করা সম্ভব হয়, যা প্রথাগত উপায়ে প্রায় অসম্ভব ছিল।

২. ভৌগোলিক সীমানার বিলুপ্তি ও বৈশ্বিক অংশগ্রহণ (Borderless Giving):

ডিজিটাল মাধ্যম বিশ্বজুড়ে দাতা ও গ্রহীতার দূরত্বকে শূন্যে নামিয়ে এনেছে। দূর দূরান্তে বা বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা (Remittance Earners) দেশের যেকোনো প্রান্তের আর্তমানবতার ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিতে পারছেন। আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের (MFS) কারণে দূর দেশ থেকেও এখন সেকেন্ডের মধ্যে সাদাকাহ পৌঁছানো সম্ভব।

৩. ক্ষুদ্র অনুদানের মহাশক্তি (Power of Micro-donations):

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাদাকাহ প্রক্রিয়ায় সমাজের সব স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। এখানে বড় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দাতার অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। একটি মানবিক পোস্টে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১,০০০ জন মানুষ যদি মাত্র ১০০ টাকা করেও বিকাশ বা নগদে দান করেন, তবে মুহূর্তেই ১,০০,০০০ টাকার তহবিল তৈরি হয়। এটি তরুণ প্রজন্ম ও মধ্যবিত্ত সমাজকে সাদাকাহর সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করেছে।

৪. তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনসচেতনতা সৃষ্টি (Awareness & Mobilization):

অনেক সময় সমাজের অবহেলিত বা প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা মূলধারার গণমাধ্যমে আসে না। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সাধারণ নাগরিকরাই সেই সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারছেন। পোস্ট শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে একটি উদ্যোগ নিমেষেই ভাইরাল বা গণদাবিতে পরিণত হতে পারে, যা দ্রুত সাহায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

৫. গ্রহীতার আত্মমর্যাদা ও গোপনীয়তা রক্ষা (Privacy and Dignity):

ইসলামে গোপন দানকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। প্রথাগত লাইনে দাঁড়িয়ে বা জনসম্মুখে ত্রাণ গ্রহণের চেয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে সরাসরি সাহায্য গ্রহীতার ব্যক্তিগত মোবাইল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া অনেক বেশি সম্মানজনক। এতে গ্রহীতার সামাজিক আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।

ডিজিটাল সাদাকাহ পদ্ধতির অসুবিধা ও ঝুঁকিসমূহ :

প্রযুক্তির যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনি এর অপব্যবহার বা কাঠামোগত কিছু অসুবিধাও রয়েছে, যা গবেষণার খাতিরে বিবেচনা করা জরুরি:

১. সাইবার অপরাধ ও আর্থিক প্রতারণা (Cyber Fraud & Scams):

সোশ্যাল মিডিয়ার অন্যতম বড় নেতিবাচক দিক হলো ভুয়া বা জাল পোস্ট। অনেক সময় প্রতারক চক্র ইন্টারনেট থেকে পুরনো বা অন্যের চিকিৎসার ছবি/ভিডিও চুরি করে নিজেদের বিকাশ বা রকেট নম্বর বসিয়ে ভুয়া আবেগঘন পোস্ট তৈরি করে। সঠিক যাচাইকরণ (Verification) ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষ অনেক সময় প্রতারিত হন।

২. জবাবদিহিতা ও আর্থিক স্বচ্ছতার অভাব (Lack of Accountability):

ব্যক্তিগত উদ্যোগে সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন টাকা তোলা হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহীত অর্থের সঠিক হিসাব বা অডিট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি টাকা উঠলে সেই উদ্ধৃত অর্থ কোথায় খরচ হচ্ছে, তার প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি (Monitoring) থাকে না।

৩. 'রিয়া' বা লোকদেখানো মানসিকতার ঝুঁকি (The Risk of 'Riya' / Ostentation):

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাদাকাহর মূল শর্ত হলো নিয়তের বিশুদ্ধতা। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার পাওয়ার প্রতিযোগিতার কারণে অনেক সময় দাতা বা প্রচারকারীর মধ্যে 'লোকদেখানো' বা আত্মপ্রচারের মানসিকতা তৈরি হতে পারে, যা সাদাকাহর আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে হ্রাস করে।

৪. অ্যালগরিদম নির্ভরতা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা (Algorithmic Bias):

সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট ছড়িয়ে পড়া অনেকাংশে এর 'অ্যালগরিদম' বা কারিগরি কৌশলের ওপর নির্ভর করে। যে পোস্টটি সুন্দর ভিডিও বা ছবির মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়, সেটি দ্রুত ভাইরাল হয়। ফলস্বরূপ, যারা প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী নন বা যাদের গল্পটি স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে না, তাদের প্রকৃত সমস্যা আড়ালেই থেকে যায়।

৫. তথ্যের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন (Privacy Breach):

ফান্ড রাইজিংয়ের জন্য অনেক সময় রোগীর অত্যন্ত সংবেদনশীল ছবি, চিকিৎসার নথিপত্র বা অসহায় পরিবারের ব্যক্তিগত তথ্য ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে এই ডেটা বা ছবিগুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যায়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

প্রতিকার:

গবেষণামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিজিটাল মাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়া সাদাকাহর সুবিধাকে শতভাগ কাজে লাগাতে এবং অসুবিধাগুলো দূর করতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:

ভেরিফাইড চ্যারিটি পেজ: ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অর্থ না পাঠিয়ে নিবন্ধিত এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'ব্লু ব্যাজ' বা ভেরিফাইড চ্যারিটি সংস্থার মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদান করা।

ক্রাউডফান্ডিং পলিসি: সরকারের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ ও আইটি নীতিমালার আওতায় অনলাইন ফান্ড রাইজিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা।

স্বচ্ছ অডিট: অর্থ সংগ্রহের পর সোশ্যাল মিডিয়াতেই খরচের রসিদ ও লাইভ আপডেট দিয়ে নিয়মিত 'Financial Transparency Report' বা আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা।

সঠিক তদারকি ও সচেতনতা বজায় রাখলে, ডিজিটাল মাধ্যম আধুনিক বিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবিক কল্যাণের সবচেয়ে কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে টিকে থাকবে।

২১. রিয়া বা প্রদর্শনপ্রিয়তা: নেক আমল ধ্বংসের কারণ

যখন কোনো আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে লোকদেখানো বা প্রশংসা পাওয়ার নিয়তে করা হয়, তবে তাকে 'রিয়া' (رِيَاء) বা প্রদর্শনপ্রিয়তা বলা হয়। ইসলামে রিয়াকে 'ছোট শিরক' বা শিরকে খফি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা মানুষের পুণ্য বা নেক আমলকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

নিচে সাদাকাহর ক্ষেত্রে রিয়ার ভয়াবহতা এবং এটি কীভাবে নেক আমল ধ্বংস করে, তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

রিয়া বা লোকদেখানো দানের সংজ্ঞা

'রিয়া' শব্দটির উৎপত্তি আরবি 'রুইয়াতুন' শব্দ থেকে, যার অর্থ দেখা বা প্রদর্শন করা। পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত না করে মানুষের প্রশংসা কুড়ানো, সমাজে দানশীল হিসেবে পরিচিতি পাওয়া বা কোনো দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে দান-সদকা করাকে সাদাকাহর ক্ষেত্রে রিয়া বলা হয়।

রিয়া কেন নেক আমল ধ্বংসের কারণ?

ইসলামে যেকোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটি প্রধান শর্ত রয়েছে:

১. আমলটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া।
২. আমলটি সম্পূর্ণ ইখলাস বা খাঁটি নিয়তে একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া।

যখনই দানে রিয়ার মিশ্রণ ঘটে, তখন দ্বিতীয় শর্তটি লঙ্ঘিত হয়। ফলে আমলটি আর আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। পবিত্র কুরআনে লোকদেখানো দানকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং একে শয়তানের অনুসরণের শামিল বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদকা নষ্ট করো না—সেই ব্যক্তির মতো, যে নিজের ধন-সম্পদ মানুষকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।" — (সূরা আল-বাকারাহ: ২৬৪) এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, লোকদেখানো মনোভাব দানের সওয়াবকে শূন্য করে দেয়। এর পরের অংশেই আল্লাহ একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন: এটি এমন একটি মসৃণ পাথরের মতো যার ওপর কিছু মাটি ছিল, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে ধুয়ে পরিষ্কার ও শক্ত পাথর বানিয়ে দিল। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে আমলটি বড় মনে হলেও কিয়ামতের দিন এর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না।

রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতের জন্য রিয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের ওপর যে জিনিসটিকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই, তা হলো ছোট শিরক।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, "রিয়া (লোকদেখানো আমল)।" (মুসনাদে আহমাদ)

সহীহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে—কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে তিন ব্যক্তিকে দিয়ে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে, তাদের মধ্যে একজন হলেন সেই দানশীল ব্যক্তি যিনি সমাজে 'দাতা' বা 'দানবীর' নাম কামানোর জন্য দান করেছিলেন। আল্লাহ তাকে বলবেন, "তুমি দুনিয়াতে দান করেছিলে যাতে তোমাকে দানশীল বলা হয়, আর তা বলাও হয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতেই তুমি তোমার প্রতিদান পেয়ে গেছো)।" এরপর তাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সাদাকাহর ক্ষেত্রে রিয়ার বর্তমান রূপ

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে সাদাকাহ বা দানের ক্ষেত্রে রিয়ার (প্রদর্শনপ্রিয়তার) রূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, জটিল এবং ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অতীতে রিয়া মূলত সীমিত ছিল এলাকার মানুষ বা সমাজের সামনে নিজেকে দাতা হিসেবে জাহির করার মধ্যে। কিন্তু এখন তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। নিচে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাদাকাহর ক্ষেত্রে রিয়ার আধুনিক রূপগুলো আলোচনা করা হলো:

⇒ ফটোসেশন ও ভিডিওগ্রাফি: অসহায় মানুষকে এক বস্তা চাল বা সামান্য কিছু টাকা দেওয়ার সময় চারপাশ থেকে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা বা ভিডিও করা এখন একটি নিয়মিত দৃশ্য। অনেক সময় দেখা যায়, গ্রহীতা লজ্জায় মুখ ঢাকছেন, কিন্তু দাতা হাসিমুখে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে পোজ দিচ্ছেন।

⇒ লাইভ স্ট্রিমিং: দান করার পুরো প্রক্রিয়াটি সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইভ' সম্প্রচার করা। বাহ্যিকভাবে একে "অন্যদের উৎসাহিত করার মাধ্যম" বলা হলেও, ভেতরের মূল উদ্দেশ্য অনেক সময়ই থাকে নিজের পেজের রিচ বাড়ানো, ভিউ পাওয়া বা নিজেকে একজন সমাজসেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

⇒ ব্যানার ও পোস্টারের মহোৎসব: শীতবস্ত্র বিতরণ বা ইফতার সামগ্রী বিতরণের চেয়েও সেখানে দাতাদের নাম ও ছবি সংবলিত বিশাল ব্যানারের দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়। অনেক সময় সামান্য মূল্যের ব্রাণের চেয়ে সেই ব্রাণের প্রচারণার ব্যানারের খরচই বেশি হয়।

⇒ ভোট ও প্রচারণার মাধ্যম: নির্বাচন বা কোনো সামাজিক পদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে হঠাৎ করে দান-সদকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া এবং নিশ্চিত করা যেন মিডিয়া বা এলাকার মানুষ তা জানতে পারে।

⇒ নেমপ্লেট বা নামফলক উন্মোচন: মসজিদ, মাদ্রাসা বা এতিমখানায় ফ্যান, এসি, কিংবা একটি পানির কল দান করলেও সেখানে বড় বড় অক্ষরে নিজের বা পরিবারের সদস্যের নাম লিখে রাখার প্রবণতা।

⇒ ঘোষণার অপেক্ষা: কোনো ওয়াজ মাহফিল বা চ্যারিটি ফান্ডে টাকা দেওয়ার সময় শর্ত থাকে যে, মাইকে সবার সামনে তার নাম ও টাকার পরিমাণ ঘোষণা করতে হবে। নাম ঘোষণা না করলে বা ভুল হলে অনেকে অসন্তুষ্ট হন, যা স্পষ্টতই রিয়ার বহিঃপ্রকাশ।

⇒ 'টপ ডোনার' বা সর্বোচ্চ দাতার স্বীকৃতি: বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দান করার পর ডোনার লিস্টে নিজের নাম সবার ওপরে দেখার সুপ্ত ইচ্ছা।

⇒ নাম গোপন রাখার (Anonymous) সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে নাম প্রকাশ করা, যাতে মানুষ কमेंট সেকশনে এসে "মাশাআল্লাহ", "আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন" বলে প্রশংসা করে।

⇒ স্ক্রিনশট শেয়ারিং: গোপনে কোনো ভালো ফান্ডে বা বিকাশ/নগদ অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে সেই সফল ট্রানজেকশনের স্ক্রিনশটটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখা—"সামান্য কিছু করার চেষ্টা করলাম।" আপাতদৃষ্টিতে একে বিনয় মনে হলেও সূক্ষ্মভাবে এটি প্রশংসা পাওয়ারই একটি চেষ্টাগ্রহীতার

⇒ পরিচয় প্রকাশ: সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তির অসহায় অবস্থার ছবি ও তার নাম-ঠিকানা ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দেওয়া, যা তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে।

⇒ অনুধাবন করানো: পরবর্তীতে কোনো আড্ডায় বা কথায় কথায় অপরকে মনে করিয়ে দেওয়া—"ও তো আমার দয়াতেই আজ এই অবস্থানে এসেছে।"

রিয়া থেকে বাঁচার উপায় ও গোপন দানের গুরুত্ব

১) সাদাকাহকে রিয়ার অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে ইসলাম 'গোপন দান' বা গোপনে সাদাকাহ করার ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছে। হাদিসে যে সাত শ্রেণীর মানুষকে কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন হলেন: "...সেই ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি খরচ করল বাম হাতও তা জানতে পারে না।" (সহীহ বুখারী)

তবে ইসলামে অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য "প্রকাশ্যে দান" করার অনুমতি আছে (সূরা বাকারাহ: ২৭১)। কিন্তু বর্তমান যুগে সামাজিক মাধ্যমের অতি-ব্যবহারের কারণে 'উৎসাহ দেওয়ার' নিয়তটি কখন যে 'নিজের প্রশংসা কুড়ানোর' নিয়তে বদলে যায়, তা মানুষ নিজেও টের পায় না। ইমাম গাজালী (রহ.) বলেছিলেন, "রিয়া কাল পিঁপড়ের পায়ের আওয়াজের চেয়েও সূক্ষ্ম।" তাই বর্তমান যুগে দাতার নিয়তকে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

২) দানের পূর্বে নিয়ত বারবার পরীক্ষা করতে হবে। দানের আগে, দানের সময় এবং দানের পরে নিজের মনকে প্রশ্ন করা—এই দান কি আমি আল্লাহর জন্য করছি, নাকি মানুষের প্রশংসার জন্য?

৩) রিয়ার সূক্ষ্ম আক্রমণ থেকে বাঁচতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো দোয়াটি বেশি বেশি পড়া উচিত:

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা শাইআন ওয়া আনা আ'লামু, ওয়া আস্তাগফিরূকা লিমা লা আ'লামু।" (অর্থ: হে আল্লাহ! জেনে-বুঝে তোমার সাথে শিরক করা থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই এবং না বুঝে যা করে ফেলি তার জন্য ক্ষমা চাই।)

সাদাকাহ হলো বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর ভালোবাসার একটি প্রমাণ। কিন্তু রিয়া বা প্রদর্শনপ্রিয়তা এই সুন্দর আমলটিকে একটি নিষ্প্রাণ, সওয়াবহীন এবং উল্টো গুনাহের পুঁজিতে পরিণত করে। তাই আমাদের উচিত, দানের পরিমাণ ছোট হলেও তা সম্পূর্ণ প্রদর্শনপ্রিয়তা মুক্ত ও ইখলাসের সাথে করার চেষ্টা করা।

২২. দাওয়াতি কার্যক্রম ও নওমুসলিমদের পুনর্বাসনে সাদাকাহ

ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ, দীনের প্রচার এবং নবদীক্ষিত মুসলিমদের (নওমুসলিম) সুরক্ষায় সাদাকাহ ও যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। ইসলাম কেবল একটি আধ্যাত্মিক ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের আত্মিক ও সামাজিক উভয় চাহিদাই পূরণ করে। দাওয়াতি কার্যক্রম ও নওমুসলিমদের পুনর্বাসনে সাদাকাহর গুরুত্ব ও এর বিভিন্ন দিক নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ইসলামের দৃষ্টিতে নওমুসলিমদের অধিকার: 'মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম'

পবিত্র কুরআনে যাকাত ও সাদাকাহর যে আটটি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো 'মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম' যার অর্থ হলো 'যাদের অন্তর জয় করা আকর্ষণীয় বা আবশ্যিক'।

"নিশ্চয়ই সাদকা (যাকাত) হচ্ছে ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী এবং যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন (নওমুসলিম বা ইসলামের প্রতি অনুরাগী) তাদের জন্য..." (সূরা আত-তাওবাহ: ৬০)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছেন অথবা যাদের ইসলামের প্রতি অনুরাগী করে তোলা প্রয়োজন, তাদের অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করা মুসলিম উম্মাহর ওপর একটি সামষ্টিক দায়িত্ব (ফরজে কিফায়াহ)।

নওমুসলিমদের পুনর্বাসনে সাদাকাহর ভূমিকা

একজন মানুষ যখন অন্য কোনো ধর্ম বা আদর্শ ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাকে নানামুখী সামাজিক ও মানসিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। এই সময়ে সাদাকাহ কীভাবে তাদের পুনর্বাসনে কাজ করে, তা নিচে দেওয়া হলো:

ক. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান:

অধিকাংশ নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অনেক সময় তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। সাদাকাহর ফান্ডের মাধ্যমে তাদের জন্য তাৎক্ষণিক নিরাপদ আবাসন, খাদ্য এবং পোশাকের ব্যবস্থা করা জরুরি।

খ. কর্মসংস্থান ও স্থায়ী পুনর্বাসন:

সাময়িক সাহায্য দেওয়ার চেয়ে নওমুসলিমদের স্বাবলম্বী করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাদাকাহর অর্থ দিয়ে তাদের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি, রিকশা বা ভ্যান কেনা, সেলাই মেশিন প্রদান কিংবা কোনো কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন।

গ. আইনি সহায়তা:

অনেক নওমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের কারণে মিথ্যা মামলা বা পারিবারিক আইনি জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। সাদাকাহর অর্থ দিয়ে তাদের জন্য ভালো আইনজীবীর ব্যবস্থা করা এবং আইনি লড়াইয়ের খরচ বহন করা যায়।

ঘ. সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ বিয়ে:

পরিবার ছেড়ে আসার পর নওমুসলিম তরুণ-তরুণীরা একাকীত্ব ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। সাদাকাহর তহবিল থেকে ব্যয় করে সামাজিকভাবে তাদের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা এবং সংসার শুরুর খরচ প্রদান করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

নওমুসলিমদের দ্বীনি শিক্ষায় সাদাকাহর গুরুত্ব

- ⇒ কেবল অর্থনৈতিক পুনর্বাসনই শেষ কথা নয়; একজন নওমুসলিম যেন ইসলামকে সঠিকভাবে জেনে নিজের ঈমান রক্ষা করতে পারেন, সে জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।
- ⇒ বিশেষায়িত মাদ্রাসা ও শিক্ষা কেন্দ্র: নওমুসলিমদের জন্য বিশেষ স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি কোর্স, ডে-কেয়ার বা আবাসিক মাদ্রাসার ব্যবস্থা করা, যেখানে তারা শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত, সালাত এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিখতে পারবেন।
- ⇒ স্কলারশিপ ও উপবৃত্তি: নওমুসলিম শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা, যেন অর্থাভাবে তাদের পড়াশোনা বন্ধ না হয়।

দাওয়াতি কার্যক্রমে সাদাকাহর ভূমিকা

দীন প্রচার বা দাওয়াত ইলাল্লাহর পথকে সুগম করতে সাদাকাহ একটি শক্তিশালী জ্বালানি হিসেবে কাজ করে।

ক. দাওয়াতি উপকরণ ও সাহিত্য প্রকাশনা:

অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনের অনুবাদ, নির্ভরযোগ্য ইসলামী বই, লিফলেট বিনামূল্যে বিতরণ করা প্রয়োজন। এই প্রকাশনা ও বিতরণের সমস্ত খরচ সাদাকাহ এবং ওয়াকফ (স্থায়ী দান) তহবিল থেকে মেটানো হয়।

খ. আধুনিক মিডিয়া ও প্রযুক্তির ব্যবহার:

বর্তমান যুগে দাওয়াতি কাজের বড় অংশই হয় ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইউটিউব এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে মানসম্মত ইসলামী কনটেন্ট তৈরি, অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট এবং দাওয়াহ প্ল্যাটফর্ম সচল রাখার পেছনে বড় অংকের অর্থের প্রয়োজন হয়, যা সাদাকাহর মাধ্যমে জোগাড় করা সম্ভব।

গ. দুআ'ত (দাঁড়ি) বা ধর্মপ্রচারকদের ভাতা প্রদান:

যারা নিজেদের জীবনকে পূর্ণকালীন দাওয়াতি কাজের জন্য উৎসর্গ করেছেন, তাদের এবং তাদের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া উম্মাহর দায়িত্ব। সাদাকাহ ও জাকাতের অর্থ দিয়ে এই দাঁড়ীদের উপযুক্ত সম্মান নিশ্চিত করা যায়, যাতে তারা নিশ্চিন্তে দীনের কাজ করতে পারেন।

ঘ. অমুসলিমদের প্রতি মানবিক দাওয়াত:

ইসলামের সৌন্দর্য কেবল কথার মাধ্যমে নয়, আচরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয়। অনাহারী অমুসলিমদের মাঝে খাবার বিতরণ, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, কিংবা দুর্ঘটনের সময় অমুসলিম এলাকায় ত্রাণ সাহায্য পাঠানো সাদাকাহর এই মানবিক রূপটি বহু মানুষের অন্তরকে ইসলামের দিকে ধাবিত করে। একে বলা হয় 'আচরণের মাধ্যমে দাওয়াত'।

রমাদানকে ঘিরে আমাদের দায়িত্ব

রমাদান হলো আল-কুরআন নাজিলের মাস, যা মানবজাতির জন্য হেদায়েত বা দাওয়াহর মূল উৎস। ইসলামের ইতিহাসে বদর বিজয় ও মক্কা বিজয়ের মতো মহান ঘটনাগুলো এই রমাদানেই ঘটেছিল। এই বিজয়ের মাসে ইসলামের প্রচার-প্রসার (দাওয়াহ) এবং যারা নতুন ইসলামে প্রবেশ করেছেন (নওমুসলিম), তাদের ঈমানী সুরক্ষায় দান করা এই মাসের মূল চেতনার সাথে হুবহু মিলে যায়। এটি ইসলামের প্রচার ও বিজয়কে বেগবান করার একটি অন্যতম মাধ্যম।

একজন নতুন মুসলিমের জন্য জীবনের প্রথম রমাদান মাসটি আধ্যাত্মিকভাবে আনন্দের হলেও সামাজিকভাবে অত্যন্ত কঠিন এবং পরীক্ষামূলক হতে পারে। অনেক নওমুসলিম তাদের অমুসলিম পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। যেখানে সাধারণ মুসলিমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে সাহরি ও ইফতারের উৎসবমুখর পরিবেশ পান, সেখানে একজন নওমুসলিমকে হয়তো সম্পূর্ণ একা, এমনকি অনেক সময় লুকিয়ে সাহরি ও ইফতার করতে হয়। রমাদানে এই ভাই-বোনদের পাশে সাদাকাহ নিয়ে দাঁড়ালে তারা অনুভব করেন যে, রক্তসম্পর্কের পরিবার পাশে না থাকলেও বিশাল এক মুসলিম উম্মাহ তাদের ভাই-বোন হিসেবে জড়িয়ে ধরেছে। এই অনুভূতি তাদের ঈমানকে পাহাড়ের মতো দৃঢ় করতে সাহায্য করে।

রমাদানে সাদাকাহর অর্থ দিয়ে যদি কোনো অভাবী বা একাকী নওমুসলিমের জন্য মাসব্যাপী সাহরি ও ইফতারের আয়োজন করা যায়, তবে নিজের রোজার পাশাপাশি একজন নতুন মুসলিমের রোজার পূর্ণ সওয়াবও আমলনামায় যোগ হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো রোঝাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তবে রোজাদারের সওয়াব সামান্যও কম করা হবে না।" (তিরমিজি)

রমাদানের এই সময়ে যদি মুসলিম সমাজ সচেতনভাবে তাদের জাকাত ও সাদাকাহর একটি অংশ নওমুসলিমদের স্থায়ী পুনর্বাসন তহবিল বা বড় কোনো দাওয়াতি প্রজেক্টে (যেমন: অমুসলিমদের জন্য কুরআন অনুবাদ বিতরণ, দাঈদের প্রশিক্ষণ) দান করেন, তবে এই বিশাল অর্থনৈতিক প্রবাহের মাধ্যমে দীনের একটি বড় ও অবহেলিত খাতের স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়।

নওমুসলিম ও দাওয়াহর কাজে দান করার অর্থ হলো ইসলামের ভবিষ্যৎ এবং একটি মানুষের ঈমান রক্ষার পেছনে বিনিয়োগ করা। তাই এই রমাদানে আমাদের সাধারণ দানের পাশাপাশি একটি অংশ যেন নিশ্চিতভাবেই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর খাতে জমা হয়।

২৩.লাইলাতুল কদর ও রমাদানের শেষ দশকের দান-সদকা

রমাদানের শেষ দশক এবং বিশেষ করে লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) মুসলিম উম্মাহর জন্য এক পরম সৌভাগ্যের সময়। এই দিন ও রাতগুলো কেবল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত বা কান্নাকাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই সময়ে দান-সদকা বা সাদাকাহ করা অত্যন্ত লাভজনক এবং অনন্য ফজিলতপূর্ণ একটি ইবাদত।

লাইলাতুল কদরে দানের ফজিলত: ৮৩ বছর ৪ মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

"লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আল-কদর: ৩)

গাণিতিক হিসাবে ১,০০০ মাস সমান ৮৩ বছর ৪ মাস। এর অর্থ হলো, লাইলাতুল কদরের রাতে কেউ যদি মাত্র ১ টাকা বা ১টি টাকাও দান করেন, তবে আল্লাহর দরবারে তার সওয়াব এমনভাবে লেখা হবে যেন সে টানা ৮৩ বছর ৪ মাস (প্রতিটি দিন ও রাত) প্রতিদিন ওই পরিমাণ টাকা দান করেছে। মানুষের গড় আয়ুও সাধারণত এত দীর্ঘ হয় না, যা কেবল এক রাতের সামান্য দানেই অর্জন করা সম্ভব।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও শেষ দশকের প্রস্তুতি

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিস অনুযায়ী, রমাদান মাস এলে রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রচণ্ড দানশীল হয়ে উঠতেন এবং যখন রমাদানের শেষ দশক আসত, তখন তাঁর ইবাদত ও ত্যাগের মাত্রা আরও বহুগুণ বেড়ে যেত।

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, "যখন রমাদানের শেষ দশক আসত, তখন নবী করীম (সা.) তাঁর লুঙ্গি শক্ত করে বাঁধতেন (বেশি ইবাদতের জন্য প্রস্তুতি নিতেন), রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারকেও জাগিয়ে তুলতেন।" (সহীহ বুখারী)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই তীব্র ইবাদতের প্রস্তুতির মধ্যে আর্থিক ত্যাগ বা দান-সদকাও शामिल ছিল। কারণ, আত্মিক ইবাদতের পাশাপাশি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয়ই হলো ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ।

শেষ দশকে দানের ক্ষেত্রে একটি অনন্য 'কৌশল' (Smart Strategy)

লাইলাতুল কদর কোন রাতে হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি; তবে তা শেষ দশকের বেজোড় রাতে (২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতে) হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই কদরের রাতের দান যেন কোনোভাবেই হাতছাড়া না হয়, সেজন্য বর্তমান যুগের স্কলাররা একটি চমৎকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন:

"শেষ দশকের প্রতিটি রাতে (টানা ১০ দিন) নিয়ম করে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণের অর্থ দান করুন।"

ধরা যাক, আপনি প্রতিদিন ১০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা বা আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো অংকের টাকা দান করার নিয়ত করলেন। যেহেতু শেষ দশকের ১০টি রাতের মধ্যেই লাইলাতুল কদর নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান, তাই আপনার এই কৌশলের কারণে লাইলাতুল কদরের রাতেও আপনার দানটি নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হবে। ফলে আপনি নিশ্চিতভাবেই ৮৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিদিন দান করার সওয়াব পেয়ে যাবেন।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য চ্যারিটি বা অনলাইন ফান্ডে 'অটো-ডোনেশন' বা প্রতিদিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দান কেটে নেওয়ার ফিচার ব্যবহার করেও এটি সহজে করা যায়।

আমাদের উচিত, এই শেষ দশকের প্রতিটি রাতকে কাজে লাগানো, সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিদিন কিছু না কিছু সদকা করা এবং লাইলাতুল কদরের মহাসম্মানিত সওয়াবের অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা।

২৪.রমাদান-পরবর্তী সময়ে সাদাকাহর ধারাবাহিকতা

রমাদান মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের অনেকের মধ্যে দান-সদকার সেই জোয়ারে কিছুটা ভাটা পড়ে যায়। মসজিদগুলো যেমন ফাঁকা হতে শুরু করে, তেমনি গরিব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর হাতগুলোও যেন গুটিয়ে আসে। কিন্তু একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি কেবল রমাদানের ইবাদতকারী নন, বরং সারা বছরের ইবাদতকারী।

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব

ক. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল:

ইসলামে আমলের পরিমাণের চেয়ে আমলের ধারাবাহিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটি, যা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা পরিমাণে কম হোক।" (সহীহ বুখারী) অর্থাৎ, রমাদানে একবারে বড় অংকের দান করে পুরো বছর হাত গুটিয়ে রাখার চেয়ে, সারা বছর প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে অল্প অল্প করে দান করা আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয়।

খ. রমাদানের আমল কবুল হওয়ার লক্ষণ:

ইসলামী স্কলারদের মতে, কোনো ভালো আমল কবুল হওয়ার অন্যতম প্রধান লক্ষণ হলো, সেই আমলের পর আরও একটি ভালো আমল করার তাওফিক হওয়া। আপনি যদি রমাদানের পর ও দান-সদকা জারি রাখতে পারেন, তবে বুঝতে হবে আপনার রমাদানের দান ও সিয়াম সাধনা আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন।

গ. মানুষের অভাব সারা বছরই থাকে:

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-বালাই কিংবা নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের মতো সংকটগুলো কেবল রমাদান মাসের ৩০ দিনের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; এগুলো বছরের ৩৬৫ দিনই থাকে। তাই রমাদান শেষ হলেই যদি আমরা দান বন্ধ করে দিই, তবে সমাজ আবার তীব্র সংকটে পড়ে যাবে।

ঘ. গুনাহ ও বিপদ থেকে আজীবন সুরক্ষা:

দান-সদকা মানুষের বিপদ-আপদ দূর করে এবং গুনাহ মিটিয়ে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সদকা গুনাহকে এমনভাবে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।" (তিরমিজি)। আমাদের গুনাহ বা বিপদ যেহেতু শুধু রমাদানে সীমাবদ্ধ নয়, তাই এর থেকে বাঁচতে সুরক্ষাকবচ বা সাদাকাহও সারা বছর জারি রাখা চাই।

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বাস্তবসম্মত উপায়

রমাদানের সেই দানশীলতার মানসিকতা সারা বছর ধরে রাখার জন্য কিছু সহজ কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে:

ক. 'ছোট কিন্তু নিয়মিত' (Micro-Donation) পলিসি

নিজেদের ওপর বড় কোনো আর্থিক চাপ না দিয়ে একটি ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। যেমন: "আমি প্রতিদিন ১০ টাকা" অথবা "প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা" অথবা "প্রতি মাসে ৫০০ টাকা" নির্দিষ্ট একটি ফান্ডে দান করব। অংকটি ছোট হলেও এর ধারাবাহিকতার কারণে আল্লাহর কাছে এটি বিশাল মর্যাদাপূর্ণ হবে।

খ. ঘরে একটি 'সাদাকাহ বক্স' বা মাটির ব্যাংক রাখা

ঘর বা অফিসের ডেস্কে একটি সাদাকাহ বক্স রাখতে পারেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় সেখানে সামান্য কিছু টাকা রাখুন। যখন বক্সটি পূর্ণ হবে, তখন কোনো অভাবী মানুষ বা মাদ্রাসায় তা দিয়ে দিন। এটি প্রতিদিন দান করার সুন্নাহ সচল রাখতে সাহায্য করবে।

গ. ডিজিটাল অটো-ডেবিট বা রেকারিং পেমেন্ট

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য চ্যারিটি ফাউন্ডেশন বা ইসলামিক অ্যাপে 'রেকারিং ডোনেশন' (Recurring Donation) বা 'অটো-ডেবিট' অপশন থাকে। আপনি যদি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংকিং থেকে প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে (যেমন: বেতনের দিন) একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাটার পারমিশন দিয়ে রাখেন, তবে ব্যস্ততার কারণেও দান করা ভুল হবে না।

ঘ. আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ (পার্সেন্টেজ) বরাদ্দ করা

আপনার মাসিক যা আয়, তা থেকে ১%, ২% বা ৫% অংশ আল্লাহর রাস্তার জন্য আলাদা করে ফেলুন। বেতন বা লভ্যাংশ পাওয়ার সাথে সাথেই সেই অংশটি সরিয়ে রাখুন। মনে করুন, এই টাকাটি আপনার ছিলই না, এটি আল্লাহর আমানত।

ঙ. স্থায়ী দান বা সদকায়ে (সদকায়ে জারিয়া) প্রজেক্টে যুক্ত হওয়া

সারা বছর বড় অংকের দান করা সবার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্য এমন কিছু প্রজেক্টে দান করুন যা স্থায়ী দান হিসেবে গণ্য হয়। যেমন: একটি টিউবওয়েল বসানো, কোনো গাছ রোপণ করা, এতিম শিশুর পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া কিংবা দ্বীনি বই বা কুরআন বিতরণের প্রজেক্টে শরিক হওয়া। এর মাধ্যমে আপনি একবার দান করলেও এর সওয়াব সারা বছর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেতে থাকবেন।

রমাদান বিদায় নিলেও রমাদানের রব (আল্লাহ তাআলা) চিরকাল আছেন এবং তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন। রমাদান আমাদের যে দানশীলতা ও সহমর্মিতার প্রশিক্ষণ দিয়েছে, তা বছরের বাকি ১১ মাস আমাদের বাস্তব জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। অল্প হোক কিংবা বেশি, দানের এই সুউচ্চ ধারা যেন আমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সচল থাকে—আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন। আমিন।

২৫.সাদাকাতুল ফিতর: উদ্দেশ্য ও বিধান

রমাদান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দান সদকাতুল ফিতর। ইসলামে সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত, যা পবিত্র রমাদান মাসের সিয়াম সাধনা শেষে আদায় করতে হয়। এটি প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য একটি আবশ্যিকীয় (ওয়াজিব) দায়িত্ব। এটি রমজানের শেষ দশকে আদায় করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঈদের নামাজের আগেই সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ‘প্রত্যেক দাস, আজাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের ওপর আল্লাহর রাসুল (সা.) সদকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর হোক বা যব হোক এক সা’ পরিমাণ আদায় করা ফরজ করেছেন এবং লোকজনের ওপর ঈদের সালাতের বের হওয়ার আগেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৫০৩)। যারা দান করলে সম্পদ হ্রাস পাবে বলে ভয় পায় তাদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর অভয় হলো, ‘কোনো দানই সম্পদে ঘাটতি সৃষ্টি করে না।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৮৮)

সাদাকাতুল ফিতরের মূল উদ্দেশ্য

রাসুলুল্লাহ (সা.) ফিতরা নির্ধারণের পেছনে প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মূলত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সঙ্গে জড়িত:

১) ঋণ-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ: রমজান মাসে রোজা রাখার সময় আমাদের অজান্তেই নানা ধরনের ছোটখাটো ভুলত্রুটি, অনর্থক কথাবার্তা বা গুনাহ হয়ে যেতে পারে। ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রোজার সেই ঘাটতিগুলো পূরণ করে দেন এবং রোজাকে পবিত্র করেন।

২) দরিদ্রদের মুখে হাসি ফোটানো: ঈদুল ফিতর আনন্দের দিন। এই খুশির দিনে যেন সমাজের কোনো দরিদ্র ও অসহায় মানুষ অনাহারে না থাকে এবং তারা যেন সবার সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে পারে, সেটাই ফিতরার মূল সামাজিক উদ্দেশ্য।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: "রাসুলুল্লাহ (সা.) সাদাকাতুল ফিতর অপরিহার্য করেছেন রোজাদারের অনর্থক ও অশ্লীল কথা-বার্তা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য।" (আবু দাউদ)

ফিতরা আদায়ের বিধান ও শর্তসমূহ

► কার ওপর ফিতরা ওয়াজিব?

ফিতরা আদায়ের জন্য যাকাতের মতো পূর্ণ এক বছর সম্পদ মালিকানায থাকার শর্ত নেই। ঈদের দিন সকালে (সাদেক বা ভোরে) যার কাছে নিজের ও পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ বাদে সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রূপা বা সাড়ে সাত তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম) সোনা অথবা এর সমমূল্যের অতিরিক্ত সম্পদ থাকবে, তার ওপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব।

⇒ পরিবারের দায়িত্ব: পরিবারের প্রধান তার নিজের এবং তার অধীনস্থ নাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবেন। (স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরা নিজেরা সামর্থ্যবান হলে নিজেদের ফিতরা নিজেরাই দেবেন, তবে স্বামী বা পিতা দিলে তাও আদায় হয়ে যাবে)।

⇒ নবজাতক: ঈদের দিন সুবহে সাদেকের পূর্বে যে শিশু জন্মগ্রহণ করবে, তার ফিতরাও দিতে হবে।

► কখন আদায় করতে হয়?

উত্তম সময়: ঈদের দিন সকাল বেলা, ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ফিতরা আদায় করা সবচেয়ে উত্তম।

অনুমোদিত সময়: রমজান মাসের শেষের দিকে (১-২ দিন আগে) অগ্রিম ফিতরা আদায় করা জায়েজ আছে, যাতে দরিদ্ররা ঈদের কেনাকাটা করতে পারে।

সতর্কতা: ঈদের নামাজ শেষ হওয়ার পর ফিতরা দিলে তা সাধারণ সদকা হিসেবে গণ্য হবে, ফিতরার বিশেষ সওয়াব পাওয়া যাবে না।

ফিতরার পরিমাণ ও খাদ্যসামগ্রী

হাদিস অনুযায়ী মূলত পাঁচটি পণ্য দিয়ে ফিতরা আদায়ের কথা এসেছে: গম (বা আটা), যব, কিসমিস, খেজুর এবং পনির। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে এই পণ্যগুলোর মাধ্যমে "সা" (এক ধরনের পরিমাপক পাত্র) হিসাবে ফিতরা দেওয়া হতো। আধুনিক পরিমাপে এর হিসাব নিচে দেওয়া হলো:

খাদ্যসামগ্রী	পরিমাপ (ওজন)	আদায়ের নিয়ম
গম বা আটা	অর্ধ 'সা' (প্রায় ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম)	সর্বনিম্ন ফিতরা নির্ধারণের মূল ভিত্তি
খেজুর	এক 'সা' (প্রায় ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম)	নবীজী (সা.)-এর অন্যতম পছন্দের মাধ্যম
কিসমিস	এক 'সা' (প্রায় ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম)	মধ্যম বা উচ্চবিত্তদের জন্য উত্তম
পনির	এক 'সা' (প্রায় ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম)	উচ্চবিত্তদের জন্য বেশি সওয়াবের মাধ্যম
যব	এক 'সা' (প্রায় ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম)	প্রচলিত খাদ্যসামগ্রী

► টাকা বা নগদ মূল্যে ফিতরা দেওয়া: অধিকাংশ হানাফি ওলামাদের মতে, খাদ্যসামগ্রীর সমপরিমাণ টাকা নগদ হিসাব করে দরিদ্রদের দিয়ে দিলেও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। বর্তমান যুগে নগদ টাকা দিলে দরিদ্র মানুষটি তার প্রয়োজনমতো (যেমন: কাপড় বা ওষুধ) খরচ করতে পারে বলে এটি বেশ গ্রহণযোগ্য ও সহজ মাধ্যম।

ফিতরা পাওয়ার উপযুক্ত কারা?

যাকাত পাওয়ার যোগ্য যারা, ফিতরা পাওয়ার যোগ্যও মূলত তারাই। ফিতরা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন সমাজের ফকির ও মিসকিনরা (অসহায়, অভাবী ও দরিদ্র মানুষ)।

ফিতরা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের গরিব আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, যদি তারা ফিতরা পাওয়ার যোগ্য হন। এতে সদকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা—উভয় সওয়াবই পাওয়া যায়।

ইসলামিক স্কলারদের মতে, ফিতরার টাকা দিয়ে কোনো মসজিদ বা মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ করা যাবে না, বরং সরাসরি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির মালিকানায় তা দিয়ে দিতে হবে (তবে এতিমখানা বা মাদ্রাসার লিল্লা ফাভে, যেখানে গরিব ও এতিম ছাত্রদের পেছনে খরচ করা হয়, সেখানে দেওয়া যাবে)।

২৬.সাদাকায়ে জারিয়া: অনন্তকালের পাথেয়

ইসলামে এমন কিছু নেক আমল বা দান রয়েছে, যার সওয়াব মানুষের মৃত্যুর পরও বন্ধ হয় না; বরং কেয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। এই চিরস্থায়ী ও চলমান দানকেই বলা হয় সাদাকায়ে জারিয়া। আরবি 'সাদাকা' শব্দের অর্থ দান এবং 'জারিয়া' শব্দের অর্থ চলমান বা প্রবাহিত। অর্থাৎ, যে দানের উপকারিতা এবং সওয়াব সময়ের সাথে শেষ হয়ে যায় না, বরং নদী বা ঝরনার ধারার মতো প্রবাহিত থাকে, তা-ই সাদাকায়ে জারিয়া। এটি মূলত একজন মুমিনের জন্য পরকালের এক অন্তহীন ও অনন্তকালের পাথেয়। নিচে সাদাকায়ে জারিয়ার গুরুত্ব, ক্ষেত্রসমূহ এবং এর বিধান বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

সাদাকায়ে জারিয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষ মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার ইহকালীন সমস্ত আমলের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। সে আর নতুন করে কোনো নামাজ, রোজা বা তসবিহ পড়ে সওয়াব অর্জন করতে পারে না। কিন্তু সাদাকায়ে জারিয়া এমন এক অনন্য ব্যবস্থা, যা মানুষকে মৃত্যুর পরও কবরে বসে সওয়াব পাওয়ার সুযোগ করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই বিষয়ে একটি অত্যন্ত বিখ্যাত হাদিস বর্ণনা করেছেন:

"মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়; তিনটি আমল ছাড়া—

১. সাদাকায়ে জারিয়া (চলমান দান),
২. এমন জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, এবং
৩. এমন সৎ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।" (সহীহ মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, মুমিন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সওয়াব পেতে থাকে, তার মধ্যে রয়েছে—কোনো বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ও তা প্রচার করা, সৎ সন্তান রেখে যাওয়া, কোরআন শরিফ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাওয়া, মসজিদ নির্মাণ করা, মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করা, নদী বা খাল খনন করা এবং সুস্থ অবস্থায় নিজের সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা। (ইবনে মাজাহ)

সাদাকায়ে জারিয়ার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

আমরা আমাদের চারপাশে খুব সহজেই এমন কিছু স্থায়ী কল্যাণমূলক কাজ করতে পারি, যা সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। যেমন:

- ১) জ্ঞান বিতরণ ও দ্বীনি বইপত্র তৈরি: মানবকল্যাণে আসে এমন যেকোনো জ্ঞান ছড়ানোই সাদাকায়ে জারিয়া। ইসলামিক বা উপকারী জ্ঞানগর্ভ বই রচনা করা, প্রকাশ করা বা কাউকে কিনে দেওয়া এর অন্তর্ভুক্ত। যতদিন মানুষ সেই বই পড়ে উপকৃত হবে, ততদিন লেখক ও দাতা সওয়াব পাবেন।
- ২) মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ: আল্লাহর ইবাদতের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা বা দ্বীনি শিক্ষার জন্য মাদরাসা তৈরিতে অবদান রাখা অন্যতম সেরা সাদাকায়ে জারিয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" (সহীহ বুখারি)
- ৩) বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা: কোনো শুষ্ক বা অভাবী এলাকায় টিউবওয়েল, কুয়া বা পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করে দেওয়া একটি মহান ইবাদত। সাহাবি সাদ ইবনে উবাদাহ (রা.) নবীজী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন

সাদাকা সবচেয়ে উত্তম? নবীজী (সা.) উত্তর দিয়েছিলেন, "পানি পান করানো।" (আবু দাউদ)

৪) বৃক্ষরোপণ বা গাছ লাগানো: কোনো ফলদ বা ছায়াদার গাছ রোপণ করাও সাদাকায়ে জারিয়া। যতদিন সেই গাছ মানুষকে ছায়া দেবে, তার ফল মানুষ বা পশুপাখি খাবে, ততদিন রোপণকারীর আমলনামায় সদকার সওয়াব লেখা হবে।

৫) জনকল্যাণমূলক অবকাঠামো নির্মাণ: রাস্তাঘাট মেরামত করা, সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য সেতু বা কালভার্ট বানিয়ে দেওয়া, হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরিতে সাহায্য করা, যেখানে মানুষ বছরের পর বছর সেবা পাবে।

৬) উত্তরাধিকারীদের জন্য কোরআন রাখা: কোনো মসজিদ বা হেফজখানায় কোরআন শরিফ বা প্রয়োজনীয় কিতাব ওয়াকফ (দান) করে দেওয়া।

সাদাকায়ে জারিয়া কবুল হওয়ার শর্তসমূহ

যেকোনো সাধারণ দানের মতো সাদাকায়ে জারিয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে:

⇒ খাঁটি নিয়ত (ইখলাস): কাজটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। সমাজে নামডাক পাওয়া, বাহবা নেওয়া বা রিয়া (লোকদেখানো)-র উদ্দেশ্যে করলে পরকালে এর কোনো মূল্য থাকবে না।

⇒ হালাল উপার্জন: দানকৃত অর্থ বা সম্পদ অবশ্যই সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে উপার্জিত হতে হবে। হারাম টাকায় মসজিদ বানালো বা জনকল্যাণমূলক কাজ করলেও তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

⇒ খোঁটা না দেওয়া: দান করার পর যাকে দান করা হয়েছে তাকে ছোট করা, খোঁটা দেওয়া বা কোনো প্রকার মানসিক কষ্ট দেওয়া যাবে না। এতে দানের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

জীবিত ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকায়ে জারিয়া

সাদাকায়ে জারিয়া মূলত দুইভাবে করা যায়:

⇒ নিজের জীবনে নিজে করা (উত্তম): মানুষ যখন সুস্থ ও জীবিত থাকে, তখন সম্পদের প্রতি তার মোহ বেশি থাকে। এই অবস্থায় নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে কোনো স্থায়ী কল্যাণমূলক কাজ করে যাওয়া সবচেয়ে বেশি সওয়াবের।

⇒ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঈসালে সওয়াব: কোনো সন্তান যদি তার প্রয়াত বাবা-মায়ের রুহের মাগফিরাতের জন্য তাদের নামে কোনো টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়, এতিমখানায় দান করে বা মসজিদ নির্মাণে অংশ নেয়, তবে সেই মৃত ব্যক্তি কবরে বসেই এর সওয়াব পেতে থাকবেন।

পৃথিবীর বুক থেকে আমাদের একদিন বিদায় নিতেই হবে। ব্যাংকে জমানো টাকা, বিলাসবহুল বাড়ি কিংবা দামি গাড়ি—কোনো কিছুই আমাদের সাথে কবরে যাবে না। সাথে যাবে কেবল আমাদের আমল। তাই বুদ্ধিমান মুমিনের উচিত জীবদ্দশাতেই এমন কিছু স্থায়ী কল্যাণমূলক কাজ বা 'সাদাকায়ে জারিয়া' করে যাওয়া, যা তার মৃত্যুর পরও পরকালের অনন্ত সফরে সওয়াবের অবিরাম ধারা চালু রাখবে।

২৭. সাদাকাহ কবুলের পূর্বশর্ত ও আদবসমূহ.

ইসলামে সাদাকাহ বা দান-সদকা কেবল একটি মানবিক কাজ নয়, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর যেকোনো ইবাদত আল্লাহর দরবারে গৃহীত বা কবুল হওয়ার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত এবং আদব রয়েছে। এই শর্ত ও আদবগুলো মেনে না চললে অনেক বড় অংকের দানও মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।

সাদাকাহ কবুলের প্রধান পূর্বশর্তসমূহ

যেকোনো দান আল্লাহর দরবারে 'ইবাদত' হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য নিচের শর্তগুলো পূরণ হওয়া বাধ্যতামূলক:

ক. নিয়তের ইখলাস বা খাঁটি উদ্দেশ্য

দান কবুল হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো—দানটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হতে হবে। লোকদেখানো মনোভাব, প্রশংসা পাওয়ার আশা বা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ (যেমন: নির্বাচনে জয়ী হওয়া বা ব্যবসায়িক লাভ) এর পেছনে থাকা যাবে না।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী)

খ. উপার্জন হালাল হওয়া

আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্র বা হালাল জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। ঘুষ, সুদ, দুর্নীতি বা চুরির টাকা থেকে কোটি টাকা দান করলেও আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কেউ যদি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে—আর আল্লাহ কেবল হালালটাই গ্রহণ করেন—তবে আল্লাহ তা ডান হাতে কবুল করেন এবং তা দাতার জন্য বড় করতে থাকেন..." (সহীহ বুখারী)

গ. সুন্যাহ বা শরীয়তসম্মত উপায়ে হওয়া

দান করার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্ধারিত নীতিমালা মেনে চলতে হবে। যেমন—ফরজ যাকাত বাকি রেখে নফল সাদাকাহ করায় কোনো বাহাদুরি নেই। আগে ফরজ আদায় করতে হবে, তারপর নফল দান। একইভাবে, নিজের পরিবারকে চরম অর্থকষ্টে রেখে বাইরের মানুষকে সব দান করে দেওয়া ইসলাম সমর্থন করে না।

সাদাকাহর প্রধান আদব বা শিষ্টাচারসমূহ

দান করার সময় দাতার মানসিকতা, আচরণ এবং পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত, তা এই আদবগুলোর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়:

ক. গোপন রাখা (যতটা সম্ভব)

দানকে গোপন রাখা সাদাকাহর অন্যতম সেরা আদব। গোপন দান আল্লাহর ক্রোধকে ঠান্ডা করে এবং রিয়া (প্রদর্শনপ্রিয়তা) থেকে বাঁচায়।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো, আর যদি তা গোপনে করো এবং অভাবীদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও বেশি কল্যাণকর।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭১)

খ. খোঁটা বা কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা

কাউকে সাহায্য করার পর তাকে মুখ ফুটে মনে করিয়ে দেওয়া বা এমন আচরণ করা যাতে গ্রহীতা ছোট বোধ করে—একে 'খোঁটা দেওয়া' বলে। এটি দানের সওয়াবকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদকা নষ্ট করো না।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৬৪)

গ. নিজের প্রিয় ও ভালো জিনিস থেকে দান করা

অনেকের অভ্যাস থাকে নিজের ঘরের নষ্ট, ভাঙা বা বাতিল জিনিসগুলো গরিবদের দিয়ে দেওয়া। এটি দানের আদব পরিপন্থী। নিজেকে যে স্তরের খাবার বা পোশাক দেওয়া হয়, দান করার সময়ও সেই মানের বা নিজের প্রিয় জিনিস থেকে দেওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা কখনোই পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে ব্যয় করবে।" (সূরা আল-ইমরান: ৯২)

ঘ. গ্রহীতার প্রতি বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ থাকা

দান করার সময় মনে করতে হবে—গ্রহীতা আমার ওপর এহসান করছে যে সে আমার দানটি গ্রহণ করে আমাকে সওয়াব অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে। গ্রহীতাকে কখনোই তুচ্ছ বা ছোট ভাবা যাবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) দান করার সময় দাতার হাত নিচে এবং গ্রহীতার হাত ওপরে থাকলেও মানসিকভাবে দাতাকে বিনীত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন।

ঙ. হাসিমুখে ও আনন্দের সাথে দান করা

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বা বিরক্তি নিয়ে দান করা অনুচিত। দান করার সময় মুখে মৃদু হাসি এবং আন্তরিকতা থাকা উচিত, যাতে সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিটি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কথায় আছে—"একটি ভালো কথা ও ক্ষমা করা, কষ্টদায়ক দানের চেয়ে উত্তম।" (সূরা বাকারাহ: ২৬৩)

চ. নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দেওয়া

দানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আদব হলো অগ্রাধিকারের ক্রম (Priority List) বজায় রাখা। নিজের ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা অভাবী, প্রথমে তাদের দান করতে হবে।

২৮. বিশেষ সময় ও উপলক্ষে সাদাকাহ প্রদানের ফজিলত

বছরের যেকোনো দিন, যেকোনো সময় সাদাকাহ করা সওয়াবের কাজ, তবে ইসলামে এমন কিছু বিশেষ সময়, দিন এবং উপলক্ষ রয়েছে যেগুলোতে দান করার ফজিলত ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

বিশেষ সময়সমূহ

ক. পবিত্র রমজান মাস

রমজান মাস হলো ইবাদত ও পুণ্য অর্জনের বসন্তকাল। এই মাসে যেকোনো নফল ইবাদতের সওয়াব অন্য মাসের ফরজের সমান এবং ফরজের সওয়াব ৭০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ফজিলত: রমজানে দান করলে প্রতি ফোঁটা দানের বিপরীতে বহুগুণ সওয়াব মেলে। বিশেষ করে কোনো রোযাদারকে ইফতার করালে, সেই রোযাদারের সমপরিমাণ সওয়াব দানকারী পেয়ে থাকেন, অথচ রোযাদারের সওয়াব কমানো হয় না।

খ. জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিন

ইসলামে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়, এমনকি তা জিহাদের চেয়েও উত্তম (বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া)।

ফজিলত: এই দিনগুলোতে সাদাকাহ করলে মহান আল্লাহ তার সওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। বছরের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এই দিনগুলোর নেক আমল আল্লাহর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য।

গ. পবিত্র জুমআর দিন

সপ্তাহের সাতটি দিনের মধ্যে জুমআর দিনটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বরকতময়।

ফজিলত: ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেছেন, "অন্যান্য মাসের মধ্যে রমজান মাসের যেমন মর্যাদা, সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমআ বারের মর্যাদাও তেমন। আর জুমআর দিনের সাদাকাহ অন্য দিনগুলোর সাদাকার চেয়ে অনেক বেশি ফজিলতপূর্ণ (যেমন রমজান মাসের দান বনাম অন্য মাসের দান)।"

ঘ. শেষ রাত বা তাহাজ্জুদের সময়

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বান্দাদের ডাকতে থাকেন।

ফজিলত: এই সময়ে দান-সদকা করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করা দ্রুত কবুল হয়। এটি লোকদেখানো ইবাদত থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম সেরা সময়।

বিশেষ উপলক্ষ ও পরিস্থিতি

ক. সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় (যুবক বয়সে)

মানুষ সাধারণত সুস্থ ও যুবক বয়সে ভবিষ্যতের চিন্তায় কপণতা করে। রোগাক্রান্ত হলে বা মৃত্যুর মুখোমুখি হলে দান করার চেয়ে সুস্থ অবস্থার দান আল্লাহর কাছে বেশি মূল্যবান। হাদীসের বাণী: এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন সাদাকার সওয়াব সবচেয়ে বেশি?" তিনি বললেন, "তোমার সেই সাদাকাহ, যা তুমি সুস্থ ও লোভাতুর (ভবিষ্যতের অভাবের আশঙ্কা) অবস্থায় করো—যখন তুমি সচ্ছলতার আশা রাখো এবং দারিদ্র্যের ভয় করো।" (সহীহ বুখারী)

খ. তীব্র অভাব, মহামারী বা দুর্ভিক্ষের সময়

যখন সমাজে অর্থনৈতিক মন্দা, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী দেখা দেয়, তখন মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি থাকে।

ফজিলত: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ক্ষুধার দিনে অন্নদান বা সাহায্য করাকে 'দুর্গম গিরিপথ' অতিক্রম করার সাথে তুলনা করেছেন (সূরা বালাদ, আয়াত: ১১-১৬)। সংকটের সময় অল্প দানও আল্লাহর দরবারে পাহাড়সম সওয়াব এনে দিতে পারে।

গ. আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর বিপদে

অনেকে দূরের মানুষকে দান করলেও নিজের অভাবী আত্মীয়দের খোঁজ নেন না। ইসলামে নিকটাত্মীয়দের দানের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

ফজিলত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সাধারণ কোনো দরিদ্রকে দান করলে শুধু সাদাকার সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো অভাবী আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াব পাওয়া যায়—একটি সাদাকার সওয়াব, অন্যটি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব।" (সুনানে নাসায়ী)

ঘ. জিহাদ বা দ্বীন প্রচারের কঠিন মুহূর্তে

ইসলামের রক্ষা ও দ্বীন প্রচারের জন্য যখন অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন দান করা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। যেমনটি করেছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) তাবুক যুদ্ধের সময়।

সাদাকাহ প্রদানের সার্বিক ফজিলত

১. আল্লাহর ক্রোধ প্রশমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "গোপন সদকা আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।" (তিরমিজী)

২. কিয়ামতের মাঠে ছায়া লাভ: সাত শ্রেণীর মানুষ কিয়ামতের কঠিন দিনে আরশের নিচে ছায়া পাবেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন—"যিনি এত গোপনে দান করেন যে, তাঁর ডান হাত কী দান করল, বাম হাতও তা জানতে পারে না।" (সহীহ বুখারী)

৩. সম্পদ বৃদ্ধি ও পাপ মোচন: সদকা করলে সম্পদ কমে না, বরং বরকত বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, "পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে দেয়, সদকা তেমনি বান্দার পাপকে মিটিয়ে দেয়।" (তিরমিজী)

৪. কবরের আজাব থেকে মুক্তি: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই সাদকা দানকারীর কবরের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেয়।" (তাবারানী)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে বেশি বেশি সাদাকাহ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

২৯.উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, পবিত্র রমজান মাসে সাদাকাহ বা দান-সদকা কেবল একটি ঐচ্ছিক আর্থিক ইবাদত নয়, বরং এটি আত্মিক পরিশুদ্ধি, সামাজিক সাম্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অনন্য হাতিয়ার। পুরো বছর জুড়ে সাদাকাহর সাধারণ গুরুত্ব থাকলেও, রমজান মাসে এর কার্যকারিতা ও সওয়াবের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রমজানের আগমনী বার্তা মানুষের ভেতরের কুপণতা ও লোভকে দূর করে এক পরম উদারতার জন্ম দেয়।

অত্র গবেষণায় দেখা গেছে যে, রমজানের সাদাকাহ প্রধানত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে—

- ১) আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক: এটি রোজাদারের সিয়াম সাধনাকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করে পূর্ণতা দান করে (যেমন: সাদাকাতুল ফিতর) এবং অন্তরের অহংকার ও বস্তুবাদের দেয়াল ভেঙে দেয়।
- ২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক: এটি সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটায়, ফলে ঈদের আনন্দ আর শুধু ধনীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে রমজান ভিত্তিক এই দানশীলতা অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

"সাদাকাহ হলো এমন এক প্রবহমান বাতাস, যা সমাজের প্রতিটি কোণে অভাবী মানুষের জন্য স্বস্তি ও প্রশান্তি বয়ে আনে।" তাই, রমজানের এই মহান শিক্ষাকে শুধু একটি নির্দিষ্ট মাসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে, এর থেকে প্রাপ্ত উদারতা ও সহমর্মিতার অভ্যাস বছরজুড়ে ধরে রাখাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। তবেই একটি বৈষম্যহীন, মানবিক ও তাকওয়াপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব—যা ইসলাম ও রমাদানের মূল লক্ষ্য।